সভাপতি মাও সেতুঙের উদ্ধৃতি

★

সারা দুনিয়ার সর্বহারা, এক হও!

সভাপতি মাও সেতুঙের উদ্ধৃতি

★

বিদেশী ভাষা প্রকাশনালয়
পিকিং ১৯৭২

প্রথম সংস্করণ ১৯৭২

চীন গণ প্রজাতন্ত্রে মুদ্রিত

সূচীপত্র

১.	কমিউনিস্ট পার্টি	১
২.	শ্রেণী ও শ্রেণীসংগ্রাম	৯
৩.	সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম	২৫
৪.	জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা	৫১
৫.	যুদ্ধ ও শান্তি	৬৬
৬.	সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ	৮২
৭.	সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও	৯৩
৮.	গণযুদ্ধ	১০০
৯.	গণফৌজ	১১৩
১০.	পার্টি-কমিটির নেতৃত্ব	১১৮

১১. গণ লাইন ১৩৫
১২. রাজনৈতিক কাজ ১৫৪
১৩. অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক ১৭০
১৪. সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক ১৭৬
১৫. প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ১৮১
১৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ১৮৯
১৭. জনগণের সেবা করা ১৯৪
১৮. দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ ২০০
১৯. বিপ্লবী বীরত্ব ২০৮
২০. অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন ২১৪
২১. আত্মনির্ভরতা ও কঠোর সংগ্রাম ২২৪
২২. চিন্তাধারার পদ্ধতি ও কাজের পদ্ধতি ২৩৫
২৩. তদন্ত ও পর্যালোচনা ২৬৮
২৪. ভুল চিন্তাধারার সংশোধন ২৭৭
২৫. ঐক্য ২৯৪
২৬. শৃংখলা ২৯৮
২৭. সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা ৩০৩
২৮. কমিউনিস্ট ৩১৫
২৯. কেডার ৩২৫
৩০. তরুণ সম্প্রদায় ৩৪০
৩১. নারী ৩৪৭
৩২. সংস্কৃতি ও শিল্পকলা ৩৫৩
৩৩. অধ্যয়ন ৩৬০

১. কমিউনিস্ট পার্টি

আমাদের কার্যের নেতৃত্বের কেন্দ্র শক্তি হচ্ছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি।

আমাদের চিন্তাধারার পথনির্দেশের তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ।

চীন গণ প্রজাতন্ত্রের প্রথম জাতীয় গণ-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪)

যদি বিপ্লব করতে হয়, তা'হলে অবশ্যই একটা বিপ্লবী পার্টি থাকতে হবে। একটা বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্বে এবং বিপ্লবী রীতিতে গড়ে উঠা একটা বিপ্লবী পার্টি ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণী ও ব্যাপক জনসাধারণকে

সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করতে নেতৃত্বদান করা অসম্ভব।

"সারা দুনিয়ার বিপ্লবী শক্তি এক হও, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো" (নভেম্বর, ১৯৪৮)

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রচেষ্টা ছাড়া, চীনা জনগণের প্রধান অবলম্বন হিসেবে চীনের কমিউ-নিস্টদের ছাড়া, চীনের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন অসম্ভব, চীনের শিল্পায়ত্তকরণ ও কৃষির আধুনিকী-করণও অসম্ভব।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে সমগ্র চীনের জনগণের নেতৃত্বের কেন্দ্র। এই কেন্দ্র ছাড়া, সমাজতন্ত্র জয়লাভ করতে পারে না।

চীনের নয়া গণতান্ত্রিক যুব-লীগের তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত সকল প্রতি-নিধিদের সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ (২৫শে মে, ১৯৫৭)

সুশৃংখলাবদ্ধ, মার্কসবাদ–লেনিনবাদের তত্ত্বে সুসজ্জিত, আত্মসমালোচনার পদ্ধতি প্রয়োগকারী ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত একটি পার্টি; এমন একটি পার্টির নেতৃত্বাধীন একটি সৈন্যবাহিনী; এমন একটি পার্টির নেতৃত্বে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণী ও বিপ্লবী দলগুলির একটি যুক্তফ্রণ্ট—এই তিনটি প্রধান অস্ত্রের সাহায্যে আমরা শত্রুকে পরাজিত করেছি।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

জনসাধারণের উপর অবশ্যই আমাদের আস্থা রাখতে হবে, পার্টির উপর অবশ্যই আমাদের আস্থা রাখতে হবে; এ হচ্ছে দু'টি মৌলিক নীতি। যদি আমরা এ দু'টি নীতিতে সন্দেহ করি, তা'হলে কোনো কাজই আমরা সম্পন্ন করতে পারবো না।

"কৃষি-সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও মতাদর্শে সুস-জ্জিত চীনা কমিউনিস্ট পার্টি চীনা জনগণের

কাছে এনে দিয়েছে একটা নতুন কর্মরীতি ; এই কর্মরীতি হলো মূলতঃ তত্ত্ব ও অনুশীলনের সংযোজনের রীতি, জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হবার রীতি এবং আত্মসমালোচনা করার রীতি।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

একটি মহান বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক পার্টির যদি বিপ্লবী তত্ত্ব না থাকে, ইতিহাসের জ্ঞান না থাকে এবং বাস্তব আন্দোলনের গভীর উপলব্ধি না থাকে, তা'হলে তার পক্ষে বিজয় লাভ করা অসম্ভব।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

আমরা যেমন বলতাম, শুদ্ধিকরণ আন্দোলন হচ্ছে "মার্কসবাদী শিক্ষার একটা সর্বব্যাপী আন্দোলন"। শুদ্ধিকরণের অর্থই হলো সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে সমগ্র পার্টি কর্তৃক মার্কসবাদ অধ্যয়ন করা। শুদ্ধিকরণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবেই মার্কসবাদকে আরো বেশী করে শিখে নিতে পারি।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

চীনের কয়েক শত মিলিয়ন জনসাধারণের জন্য উন্নততর জীবন সুনিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ আমাদের দেশটিকে একটি সুসমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও উচ্চমানের সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে একটা দুরূহ কর্তব্য। বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও শুদ্ধিকরণ আন্দোলন চালানো আমাদের অবশ্যকর্তব্য এবং যা ভ্রান্ত তার থেকে অবিরামভাবে আমাদেরকে মুক্ত রাখতে হবে, যাতে করে আমরা এই কর্তব্য আরো ভালভাবে বহন করতে পারি এবং যাঁরা সংস্কার সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও উচ্চ আদর্শে প্রবৃত্ত

এমন সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে আরো ভালভাবে কাজ করতে সমর্থ হই।

ঐ

কর্মনীতি হচ্ছে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির সমস্ত বাস্তব কার্যকলাপের প্রারম্ভিক বিন্দু এবং কার্যকলাপের প্রক্রিয়া ও পরিণতির মধ্য দিয়ে তা নিজকে প্রকাশ করে। একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টির যে কোনো কার্যকলাপই হলো তার কর্মনীতি প্রয়োগ করা। যদি সে নির্ভুল কর্মনীতি অনুসরণ না করে, তা'হলে সে ভ্রান্ত কর্মনীতি অনুসরণ করে; সচেতনভাবে কোনো নির্দিষ্ট কর্মনীতি অনুসরণ না করলে, সে অন্ধভাবে তা' অনুসরণ করছে। আমরা যাকে অভিজ্ঞতা বলি, তা' হচ্ছে কর্মনীতি অনুসরণের প্রক্রিয়া ও পরিণতি। কেবলমাত্র জনগণের অনুশীলনের মাধ্যমেই, অর্থাৎ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই একটা কর্মনীতি ভুল কি নির্ভুল তা' আমরা যাচাই করতে পারি এবং সেটা কতটা ভুল বা কতটা নির্ভুল তা' নির্ধারণ করতে পারি। কিন্তু

মানুষের অনুশীলন, বিশেষ করে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক পার্টি ও বিপ্লবী জনসাধারণের অনুশীলন কোনো না কোনো কর্মনীতির সঙ্গে জড়িত না হয়েই পারে না। সেজন্য, কোনো কাজ করার আগে পার্টিসদস্যদের কাছে ও জনসাধারণের কাছে বাস্তব অবস্থার আলোকে যে কর্মনীতি আমরা রচনা করেছি সেই নীতিকে অবশ্যই আমাদেরকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অন্যথায়, পার্টি-সদস্যগণ ও জনসাধারণ আমাদের কর্মনীতি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন, অন্ধভাবে কাজ করবেন এবং ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ করবেন।

"শিল্প-বাণিজ্যের কর্মনীতি সম্পর্কে"
(২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)

আমাদের পার্টি যেমনি চীনা বিপ্লবের সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতি নির্ধারণ করেছে, তেমনি তা বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ কাজের লাইন ও বিশেষ বিশেষ কর্মনীতিও নির্ধারণ করেছে। কিন্তু অনেক কমরেড আমাদের পার্টির বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ

কাজের লাইন ও কর্মনীতিকে মনে রাখতে গিয়ে প্রায়ই আমাদের পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতিকে ভুলে যান। যদি প্রকৃতই আমরা পার্টির সাধারণ লাইন ও সাধারণ কর্মনীতি ভুলে যাই, তা'হলে আমরা হবো অন্ধ, অপরিপক্ক ও হতবুদ্ধিসম্পন্ন বিপ্লবী এবং বিশেষ কাজের লাইন ও বিশেষ কর্মনীতি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে আমরা হয়ে পড়ব দিশেহারা, কখনো ঝুঁকবো বাঁয়ে কখনো বা ডানে; ফলে আমাদের কাজের হবে ক্ষতি।

"শানসী-স্থইইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১লা এপ্রিল, ১৯৪৮)

কর্মনীতি এবং কৌশলই হচ্ছে পার্টির প্রাণ, সকল স্তরের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের অবশ্যই এগুলির প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে এবং কোনমতেই তাঁদের অমনোযোগী হওয়া চলবে না।

"পরিস্থিতি সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি" (২০শে মার্চ, ১৯৪৮)

২. শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম

শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংগ্রাম চলে—কোন কোন শ্রেণী জয়লাভ করে, আর কতকগুলো ধ্বংস হয়। এটাই ইতিহাস, এটাই হাজার হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ; এই দৃষ্টিকোণের বিপক্ষে রয়েছে ঐতিহাসিক ভাববাদ।

"মোহ ত্যাগ করো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও" (১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৯)

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর সদস্য হিসেবে বাস করে, তাই ব্যতিক্রমহীনভাবে সব রকমের চিন্তাধারার উপর শ্রেণীর ছাপ থাকে।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

সমাজের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ সমাজের ভেতরকার দ্বন্দ্বের বিকাশ, অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, শ্রেণী-সমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং নূতন ও পুরাতনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ; এই সব দ্বন্দ্বের বিকাশই সমাজকে সামনে ঠেলে দেয় এবং পুরাতনকে সরিয়ে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায়।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

কৃষকদের উপর জমিদারশ্রেণীর নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক উৎপীড়নই জমিদার শ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে কৃষকদের বাধ্য করেছিল।......চীনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র এই ধরনের কৃষকদের শ্রেণীসংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক যুদ্ধই হলো ঐতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালক-শক্তি।

"চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, জাতীয় সংগ্রাম হচ্ছে শ্রেণী সংগ্রামেরই ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেত-কায়দের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রই কৃষ্ণকায়দের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা কোনক্রমেই শ্রমিক, কৃষক, বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য প্রগতি-ভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে গঠিত শ্বেতকায়দের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণকায়দের ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে বিবৃতি" (৮ই আগষ্ট, ১৯৬৩)

জনগণকে সংগঠিত করাটা আমাদের উপর নির্ভর করে। চীনের প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের উৎখাত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করা নির্ভর করে আমাদের উপর। প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল বস্তু একই রকমের, তাকে আঘাত না করলে তার পতন

হবে না। এটা যেন ঝাড়ু দেবার মতো, ঝাড়ু না দিলে ধূলো নিজ থেকে সরে যায় না।

"জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি"
(১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৫)

শত্রু নিজ থেকে বিলুপ্ত হবে না। কি চীনের প্রতিক্রিয়াশীলরা, কি চীনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হামলাকারী শক্তি, কেউই আপন ইচ্ছায় ইতিহাসের মঞ্চ থেকে নেমে যাবে না।

"বিপ্লব শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাও"
(৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮)

বিপ্লব কোনো ভোজ-সভা নয়, বা প্রবন্ধ রচনা কিংবা চিত্র অংকন অথবা সূচীকর্মও এটা নয় ; এটা এত সুমার্জিত, এত ধীর-স্থির ও সুশীল, এত নম্র, দয়ালু, বিনীত, সংযত ও উদার হতে পারে না। বিপ্লব হচ্ছে একটা অভ্যুত্থান—উগ্র বলপ্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে উৎখাত করে।

"হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" (মার্চ, ১৯২৭)

চিয়াং কাই-শেক জনগণের কাছ থেকে ক্ষমতা ও লাভের প্রতিটি কণা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা? আমাদের নীতি হচ্ছে—আঘাতের বদলে তাকে আঘাত করা, প্রতি ইঞ্চি ভূমির জন্য লড়াই করা। আমরা চিয়াং কাই-শেকের পদ্ধতি অনুসারে কাজ করি। চিয়াং কাই-শেক সর্বদা জনগণের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টা করে, তার বাম হাতে আছে একটা অসি, ডান হাতে আর একটা। তার পদ্ধতি অনুসারে আমরাও অসি ধারণ করি।......এখন চিয়াং কাই-শেক তার অসিতে ধার দিচ্ছে, তাই আমাদেরও অবশ্যই আমাদের অসিতে শান দিতে হবে।

"জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি"
(১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৫)

কারা আমাদের শত্রু? কারা আমাদের বন্ধু? এটাই হলো বিপ্লবের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চীনের অতীতের সমস্ত বিপ্লবী সংগ্রামগুলো কেন

যে অত অল্প সাফল্য অর্জন করেছে তার মূল কারণ হচ্ছে, প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে না পারা। বিপ্লবী পার্টি হচ্ছে জনসাধারণের পথপ্রদর্শক, বিপ্লবী পার্টি যখন তাঁদের ভ্রান্ত পথে চালিত করে তখন কোনো বিপ্লবই সফল হতে পারে না। আমাদের বিপ্লবকে আমরা ভ্রান্ত পথে চালিত করবো না এবং অবশ্যই সফল হবো—এ বিষয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শত্রুদের আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রকৃত বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শত্রুদের ও প্রকৃত বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য চীনা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিপ্লবের প্রতি তাদের মনোভাবের সাধারণ বিশ্লেষণ অবশ্যই আমাদের করতে হবে।

"চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ" (মার্চ, ১৯২৬)

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যোগসাজশে লিপ্ত সমস্ত যুদ্ধবাজ, আমলা, মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি শ্রেণী, বড় জমিদার শ্রেণী এবং বুদ্ধিজীবীদের যে প্রতিক্রিয়াশীল অংশ তাদের সঙ্গে সংযুক্ত তারা হলো আমাদের শত্রু। শিল্পীয় সর্বহারাশ্রেণীই হলো আমাদের বিপ্লবের পরিচালক শক্তি। সমস্ত আধা-সর্বহারাশ্রেণী এবং পাতি বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের নিকটতম বন্ধু। দোদুল্যমান মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থীরা আমাদের শত্রু হতে পারে এবং বামপন্থীরা আমাদের মিত্র হতে পারে—কিন্তু আমাদের সর্বদাই সতর্ক থাকতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের ফ্রন্টের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে দেওয়া চলবে না।

ঐ

যে কোন ব্যক্তিই বিপ্লবী জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়াবে সে-ই বিপ্লবী ; যে ব্যক্তি সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের স্বপক্ষে দাঁড়ায় সে প্রতিবিপ্লবী। যে কেবল মুখে মুখেই বিপ্লবী জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়ায় কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ করে, সে বুলিতেই বিপ্লবী। যে কেবল

কথায় নয় বরং কাজেও বিপ্লবী জনগণের স্বপক্ষে দাঁড়ায়, সে একজন পুরো বিপ্লবী।

চীন গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ (২৩শে জুন, ১৯৫০)

আমি মনে করি, আমাদের পক্ষে, একজন লোক, একটা রাজনৈতিক পার্টি, একটা সৈন্যবাহিনী অথবা একটা বিদ্যালয় যদি শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তা'হলে এটা খারাপ; সে ক্ষেত্রে এর নিশ্চিত অর্থ দাঁড়ায় আমরা শত্রুর সম-পর্যায়ে পড়ে আছি। যদি আমরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হই, তা'হলে সেটা ভাল; এটা প্রমাণ করে যে, শত্রু ও আমাদের মধ্যে আমরা একটা স্পষ্ট পার্থক্য রেখা টেনেছি। যদি শত্রু আমাদের ক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করে ও একেবারে কদর্যভাবে আমাদের চিত্রিত করে এবং বলে যে, আমাদের কোনোই সদগুণ নেই, সেটা আরো উত্তম; সেটা প্রমাণ করে যে, আমরা কেবল-

মাত্র যে শত্রু ও আমাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য রেখা টানতে পেরেছি তাই নয় বরং আমরা আমাদের কাজেও বিরাট সাফল্য অর্জন করেছি।

"শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল, খারাপ নয়" (২৬শে মে, ১৯৩৯)

শত্রু যা'র বিরোধিতা করে আমাদের তা' সমর্থন করা উচিত এবং শত্রু যা' সমর্থন করে আমাদের তা'র বিরোধিতা করা উচিত।

"কেন্দ্রীয় বার্তা-সংস্থা, সাও তাং পত্রিকা ও সিন মিন পত্রিকার তিনজন সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার" (১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)

আমরা সর্বহারাশ্রেণী ও জনসাধারণের স্বপক্ষে দাঁড়াই। কমিউনিস্টদের জন্য এর অর্থ হচ্ছে যে, পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী, পার্টির মেজাজ ও পার্টির কর্মনীতির স্বপক্ষে তাঁদের দাঁড়াতে হবে।

"সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

বন্দুকধারী শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার পরেও বন্দুকহীন শত্রু থাকবেই, তারা অবশ্যই আমাদের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করবে এবং এই শত্রুদের আমাদের কোনো মতেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। যদি আমরা এখন এই সমস্যাকে এইভাবে তুলে না ধরি এবং এইভাবে উপলব্ধি না করি, তা'হলে আমরা মস্ত বড় ভুল করবো।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

সাম্রাজ্যবাদীরা এবং দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের পরাজয়কে নিশ্চয়ই নির্বিবাদে মেনে নেবে না, তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। দেশব্যাপী শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের পরেও তারা নানা উপায়ে ধ্বংসাত্মক কাজ চালাবে ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে আবার চীনকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে অপচেষ্টা করবে। এটা অবশ্যম্ভাবী ও সন্দেহাতীত; আমাদের কোনো অবস্থাতেই নিজেদের সতর্কতাকে শিথিল করা চলবে না।

চীন গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

আমাদের দেশে, মালিকানার ক্ষেত্রে যদিও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মোটামুটিভাবে সম্পন্ন করা হয়ে গেছে, যদিও পূর্বের বিপ্লবকালীন পর্যায়ের বিরাটাকার প্রবল ঝড়ের মতো জনসাধারণের শ্রেণী সংগ্রাম মূলতঃ শেষ হয়েছে, তবুও ক্ষমতাচ্যুত জমিদার শ্রেণী ও মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি শ্রেণীর অবশিষ্টাংশ এখনো বিদ্যমান, বুর্জোয়াশ্রেণীও বিদ্যমান আর পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর পুনর্গঠন সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এখনো শ্রেণীসংগ্রামের অবসান কোনমতেই ঘটে নি। সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রাম, এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণীসংগ্রাম সুদীর্ঘ

ও আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হবে, কখনো বা তা অত্যন্ত তীব্র হবে। সর্বহারাশ্রেণী নিজের বিশ্ব-দৃষ্টিকোণ অনুসারে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে চায়, বুর্জোয়াশ্রেণীও নিজের বিশ্বদৃষ্টিকোণ অনুসারে পৃথিবীর রূপান্তর ঘটাতে চায়। এ সম্পর্কে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে কে জিতবে, কে হারবে, সে সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা এখনো হয় নি।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে মতাদর্শগত সংগ্রামে কে জিতবে, কে হারবে, সে প্রশ্নের মীমাংসা হ'তে এখনো বেশ দীর্ঘ সময় লাগবে। তার কারণ এই যে, বুর্জোয়াশ্রেণী এবং পুরানো সমাজ থেকে আসা বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব আমাদের দেশে আরো দীর্ঘদিন থাকবে এবং তাদের শ্রেণীগত মতাদর্শও দীর্ঘস্থায়ী হবে। এটা যদি যথেষ্টভাবে উপলব্ধি করা না যায় অথবা আদৌ

উপলব্ধি করা না যায়, তা'হলে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করা হবে এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম চালানর অপরিহার্যতাকে উপেক্ষা করা হবে।

ঐ

আমাদের দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ও পাতি বুর্জোয়া-শ্রেণীর মতাদর্শ, মার্কসবাদবিরোধী মতাদর্শ দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকবে। আমাদের দেশে সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলতঃ কায়েম হয়েছে। উৎপাদন উপকরণের মালিকানার রূপান্তরের ক্ষেত্রে আমরা মোটামুটি বিজয়লাভ করেছি, কিন্তু রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ফ্রণ্টে আমরা এখনো সম্পূর্ণ বিজয় অর্জন করি নি। মতাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে কে জিতবে, কে হারবে, সে প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা এখনো হয় নি। বুর্জোয়া-শ্রেণী ও পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শের বিরুদ্ধে এখনো আমাদের দীর্ঘকালীন সংগ্রাম চালাতে হবে। একথা বুঝতে না পারা এবং মতাদর্শগত সংগ্রাম ত্যাগ করা ভুল। সমস্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা, সমস্ত

বিষাক্ত আগাছা, সমস্ত দৈত্য-দানবকে অবশ্যই সমালোচনা করতে হবে, কোনো অবস্থাতেই তা-দেরকে অবাধে বিস্তার লাভ করতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই সমালোচনা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, বিশ্লেষ-ণাত্মক ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া উচিত, এবং কখনো উগ্র, আমলা মনোভাবপূর্ণ, আধিবিদ্যক ও গোঁড়া-মিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

গোঁড়ামিবাদ ও সংশোধনবাদ উভয়ই মার্কস-বাদের পরিপন্থী। মার্কসবাদ অবশ্যই এগিয়ে যাবে, অনুশীলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তা বিকাশ লাভ করবে, এটা অচল থাকতে পারে না। নিশ্চল ও অপরিবর্তিত থাকলে এটা হয়ে পড়বে প্রাণহীন। কিন্তু মার্কসবাদের মৌলিক নীতিকে অবশ্যই লংঘন করা চলবে না, করলে ভুল করা হবে। আধিবিদ্যক দৃষ্টিকোণ দিয়ে মার্কসবাদকে দেখা এবং এটাকে অনড়-অটল কিছু একটা বলে ভাবাই হচ্ছে গোঁড়ামিবাদ। মার্কসবাদের মৌলিক নীতিগুলি অস্বীকার করা ও মার্কসবাদের সর্বজনীন সত্যকে অস্বীকার করাই হচ্ছে সংশোধনবাদ। সংশোধনবাদ হচ্ছে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শেরই একটা রূপ। সংশোধনবাদীরা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবা-দের মধ্যকার পার্থক্য এবং সর্বহারাশ্রেণীর এক-নায়কত্ব ও বুর্জোয়াশ্রেণীর একনায়কত্বের মধ্যকার পার্থক্যকে স্বীকার করে না। তারা যার ওকালতি করে তা প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক লাইন নয়, তা পুঁজিবাদের লাইন। বর্তমান অবস্থায়, গোঁড়ামিবাদের চেয়ে সংশোধনবাদই বেশী অনিষ্টকর। মতাদর্শগত ফ্রণ্টে আমাদের বর্তমানের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হচ্ছে সংশোধনবাদের সমালোচনা প্রসারিত করা।

ঐ

সংশোধনবাদ বা দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ হচ্ছে এক ধরনের বুর্জোয়া ভাবধারা, এটা গোঁড়ামিবাদের চেয়ে আরো বেশী বিপজ্জনক। সংশোধনবাদীরা,

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা মুখে মার্কসবাদ আওড়ায়, তারাও "গোঁড়ামিবাদকে" আক্রমণ করে। কিন্তু আসলে তারা যার উপর আক্রমণ করছে, সেটা হলো মার্কসবাদের সবচেয়ে মৌলিক বস্তু। তারা বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের বিরোধিতা করে বা তা বিকৃত করে, তারা জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধিতা করে বা তা দুর্বল করতে অপচেষ্টা করে এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ও সমাজতান্ত্রিক গঠনের বিরোধিতা করে বা তা দুর্বল করার অপচেষ্টা করে। আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মৌলিক বিজয়ের পর সমাজে এখনো এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে; তারা মতাদর্শসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে লড়াই করে। এই সংগ্রামে সংশোধনবাদীরাই হচ্ছে তাদের দক্ষিণহস্ত।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

৩. সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

কমিউনিজম হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শের একটা পূর্ণাংগ ব্যবস্থা এবং একই সময়ে তা একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থাও বটে। অন্য যে কোনো মতাদর্শ-গত ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে এটা ভিন্ন, মানব ইতিহাসে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী সম্পূ-র্ণাংগ, প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও যুক্তিসঙ্গত। সামন্তত-ন্ত্রের মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ইতিহাসের যাদুঘরের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদের মতাদর্শগত ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থাও পৃথিবীর এক অংশে (সোভিয়েত ইউনিয়নে) যাদুঘরে স্থান নিয়েছে; অন্যান্য দেশেও এর অবস্থা হয়ে উঠেছে "পশ্চিম পাহাড়ের ওপারে অস্তগামী সূর্যের ন্যায়, দ্রুত অবনতিশীল মুমূর্ষু ব্যক্তির মতো" এবং শীঘ্রই

যাদুঘরে এর স্থান হবে। কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মতাদর্শের ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা যৌবন ও প্রাণ-শক্তিতে পরিপূর্ণ; তা হিমানী-সম্প্রপাতের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ও প্রচণ্ড বজ্রের শক্তিতে সারা পৃথিবী ছেয়ে ফেলছে।

"নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" (জানুয়ারী, ১৯৪০)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সরিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবশেষে প্রতিষ্ঠিত হবেই, এটা হচ্ছে মানুষের ইচ্ছা-মুক্ত বাস্তব নিয়ম। প্রতিক্রিয়াশীলরা ইতিহা-সের রথচক্রের গতিরোধ করার জন্য যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, শীঘ্র হোক বা দেরিতে হোক বিপ্লব অবশ্যই ঘটবে এবং তা অনিবার্যভাবে বিজয় লাভ করবে।

"মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

আমরা কমিউনিস্টরা আমাদের রাজনৈতিক অভিমত কখনো গোপন রাখি নে। আমাদের ভবিষ্য-তের কর্মসূচী বা সর্বোচ্চ কর্মসূচী হচ্ছে চীনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজে এবং কমিউনিস্ট সমাজে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া; এটা নিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত। আমাদের পার্টির নাম এবং আমাদের মার্কসবাদী বিশ্বদৃষ্টিকোণ উভয়ই অতুলনীয়ভাবে উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় ভবিষ্যতের এই সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতি স্পষ্ট করে নির্দেশ করছে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

সামগ্রিক বিচারে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত চীনের বিপ্লবী আন্দোলনটার মধ্যে দু'টি পর্যায় অন্তর্ভুক্ত—একটি গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও অপরটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব; এ হলো দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির বিপ্লবী প্রক্রিয়া, প্রথম বিপ্লবী প্রক্রি-য়াকে শেষ করেই কেবল দ্বিতীয়টিকে সম্পন্ন করা সম্ভব। গণতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লবের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতি। সকল কমিউনিস্টেরই চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

"চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদন-শক্তিকে মুক্ত করা। কৃষি ও হস্ত-শিল্পের ব্যক্তিগত মালিকানাকে সমাজতান্ত্রিক যৌথ মালিকানায় এবং ব্যক্তিগত শিল্প বাণিজ্যের পুঁজিবাদী মালিকানাকে সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় পরিবর্তিত করার ফলে উৎপাদন-শক্তি বিস্ময়করভাবে মুক্ত হতে বাধ্য। এই ভাবেই শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের বিস্ময়কর বিস্তৃতির জন্য সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করা হয়।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ (২৫শে জানুয়ারী, ১৯৫৬)

আমরা এখন যে কেবল সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানাকে গণ-মালিকানায় পরিণত করার বিপ্লব করছি তাই নয়, বরং কারিগরী ক্ষেত্রে হস্ত-শিল্পের উৎপাদনকে বিরাটাকারের আধুনিক যান্ত্রিক উৎপাদনে পরিবর্তনেরও বিপ্লব করছি; এ দু'টি বিপ্লব পরস্পর সংযুক্ত। আমাদের দেশে যে রকম অবস্থা বিরাজমান তাতে কৃষিক্ষেত্রে এখানে প্রথমে সমবায়ের প্রবর্তন করা অবশ্য প্রয়োজন; কেবলমাত্র তারপরেই বৃহদাকার যন্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব (পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কৃষি পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে বিকাশ লাভ করে)। অতএব, শিল্প ও কৃষিকে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণ ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনকে আমাদের কোনো মতেই আলাদা ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন দু'টি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয় এবং কোনো কারণেই একটির উপরে গুরুত্ব আরোপ করে অপরটিকে অবহেলা করা উচিত নয়।

"কৃষি-সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

নতুন সমাজ ব্যবস্থা সবেমাত্র কায়েম হয়েছে এবং তাকে সুসম্বদ্ধ করার জন্য সময়ের দরকার।

যে মুহূর্তে নতুন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই তা সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ হয়ে গেছে এমন ধারণা অবশ্যই করা চলবে না কারণ তা অসম্ভব। এটাকে ধাপে ধাপে সুসম্বদ্ধ করতে হবে। চূড়ান্তভাবে এটাকে সুসম্বদ্ধ করতে হ'লে দেশে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণ সম্পন্ন করলে এবং অধ্যবসায় সহকারে অর্থনৈতিক ফ্রণ্টে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটালেই কেবল চলবে না, উপরন্তু, তা করতে রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত ফ্রণ্টেও অবিরতভাবে ও কঠোর পরিশ্রম সহকারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অবস্থার অবদানেরও প্রয়োজন রয়েছে।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ"
(১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

আমাদের দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুসম্বদ্ধ করার সংগ্রাম, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে কে

জিতবে, কে হারবে, তা' নির্ধারণ করার সংগ্রাম আরো দীর্ঘ ঐতিহাসিক সময় নেবে। কিন্তু, আমাদের সকলেরই বোঝা উচিত যে, সমাজতন্ত্রের এই নতুন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সুসম্বদ্ধ হয়ে উঠবে। আমরা নিশ্চিতভাবে আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করতে পারি।

ঐ

আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা অতি অল্প। এই সব ব্যক্তিরা আমাদের এই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের রাষ্ট্রকে পছন্দ করে না, পুরনো সমাজ ফিরে পাবার আকাংক্ষা তাদের প্রবল। যখনই কোনো সুযোগ পাবে, তারা বিশৃংখলার সৃষ্টি করবে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করার ও পুরানো চীন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা করবে। সর্বহারাশ্রেণীর ও বুর্জোয়াশ্রেণীর পথদ্বয়ের মধ্যে এবং সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথদ্বয়ের মধ্যে—তারা একগুঁয়ের মতো পরবর্তী

পথকেই বেছে নেয়। বস্তুতঃ এই পরবর্তী পথ বাস্তবায়িত করা অসম্ভব, তাই তারা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। এই রকম লোক রাজনৈতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে, শিল্প ও বাণিজ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী এবং ধর্মীয়—সকল পরিবেষ্টনের মধ্যেই রয়েছে। তারা চরম প্রতিক্রিয়াশীল।

ঐ

কৃষকদের শিক্ষাদান করা গুরুতর সমস্যা। কৃষকদের অর্থনীতি বিক্ষিপ্ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের অভিজ্ঞতা অনুসারে বিচার করলে দেখা যায়, কৃষির সামাজিকীকরণের জন্য দীর্ঘ সময় এবং সযত্ন কাজের প্রয়োজন। কৃষির সামাজিকীকরণ ছাড়া পরিপূর্ণ ও সুসম্বদ্ধ সমাজতন্ত্র হতে পারে না।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে : (১) ব্যাপক কৃষকসাধারণ পার্টির নেতৃত্বে ধাপে ধাপে সমাজতান্ত্রিক পথ ধ'রে অগ্রসর হ'তে ইচ্ছুক; এবং (২) কৃষকদের সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নেতৃত্বদানে পার্টি সক্ষম। এই দু'টি হচ্ছে বিষয়টির অন্তর্বস্তু, প্রধান গতিধারা।

"কৃষি-সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

সমবায়সমিতির নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই এই সব সংস্থায় গরীব কৃষক ও নতুন নিম্ন-মাঝারি কৃষকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, পুরানো নিম্ন-মাঝারি কৃষক এবং নতুন ও পুরানো উচ্চ-মাঝারি কৃষকরা হবে সাহায্যকারী শক্তি; কেবলমাত্র তা'হলেই পার্টির নীতি অনুসারে গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সমবায়সমিতি সুসম্বদ্ধ করা যেতে পারে, উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে, এবং সঠিকভাবে সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্পন্ন করা যেতে পারে। তা না হলে, গরীব ও মাঝারি কৃষকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না,

সমবায় সমিতি সুসম্বদ্ধ হতে পারে না, উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর কার্যকরী হতে পারে না।

"ছাংশা জেলার কাওশান থানার উথাং কৃষি উৎপাদন সমবায়সমিতির নিয়ন্ত্রণভার কি ভাবে মাঝারি কৃষকদের হাত থেকে গরীব কৃষকদের হাতে গেল"–এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

মাঝারি কৃষকদের সঙ্গে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না হওয়াটা ভুল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে কাদের উপর নির্ভর করে মাঝারি কৃষকদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সমগ্র গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করবে? নিশ্চয়ই গরীব কৃষকদের উপর, আর কারো উপরে নয়। অতীতে জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং ভূমি সংস্কার করার সময়ে এমনি করা হয়েছিল, এবং এখন ধনী কৃষক ও অন্যান্য পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে

ও কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার সময়েও এই ভাবে কাজ করতে হবে। এই উভয় বিপ্লবী পর্যায়কালের গোড়ার দিকে মাঝারি কৃষকগণ দোদুল্যচিত্ত ছিলেন। যখন তাঁরা ঘটনা প্রবাহের সাধারণ ধারা এবং বিপ্লবের আসন্ন বিজয় স্পষ্টভাবে দেখতে পান, শুধু তখনই তাঁরা বিপ্লবের পক্ষে আসেন। গরীব কৃষকদের অবশ্যই মাঝারি কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদেরকে নিজদের পক্ষে নিয়ে আসতে হবে, যাতে করে চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত বিপ্লবকে দিন দিন সম্প্রসারিত করা যায়।

"ফুআন জেলায় 'মাঝারি কৃষক সমবায়সমিতি' ও 'গরীব কৃষক সমবায়সমিতি'র শিক্ষা"–এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

অবস্থাপন্ন কৃষকদের মধ্যে গুরুতর রকমের পুঁজিবাদী ঝোঁক রয়েছে। সমবায়ীকরণ আন্দোলনে ও তার পরে দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের মধ্যে আমাদের

রাজনৈতিক কাজে যদি একটুও শিথিলতা আসে তাহ'লেই পুঁজিবাদী ঝোঁক উদ্দাম হয়ে উঠবে।

"পুঁজিবাদী ঝোঁকের বিরুদ্ধে অবশ্যই দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালাতে হবে"–এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

কৃষির সমবায়ীকরণ আন্দোলন শুরু থেকেই হয়ে এসেছে একটা গুরুতর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। এই ধরনের সংগ্রামের ভেতর দিয়ে না গিয়ে কোনো সমবায়সমিতিই স্থাপন করা যায় না। পুরানো সমাজ ব্যবস্থার জায়গায় একটা আনকোরা নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আগে, সে জায়গাটাকে অবশ্যই ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অনিবার্যভাবেই পুরানো ব্যবস্থার প্রতিফলন হিসেবে পুরানো চিন্তাধারার অবশেষ জনগণের মনে দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে থাকে, সেগুলি সহজে সরে যেতে চায় না। সমবায়সমিতি স্থাপন করার পরেও এটাকে সুসম্বদ্ধ করতে অবশ্যই আরো অনেক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হবে।

সুসম্বদ্ধ করার পরেও কর্মপ্রচেষ্টা যদি শিথিল হয়, তা'হলে তা ভেঙ্গে পড়তে পারে।

"একটা গুরুতর শিক্ষা"–এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র নতুন ধনী কৃষক গজিয়ে ওঠায় এবং বহু অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষক ধনী কৃষক হয়ে উঠতে চেষ্টা করতে থাকায় সেই অঞ্চলে পুঁজিবাদের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে পর্যাপ্ত উৎপাদন উপকরণ না থাকায় বহু গরীব কৃষক এখনো পূর্বের মতো দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছেন, কেউ দেনাগ্রস্ত হয়েছেন, কেউ কেউ নিজের জমি বিক্রি করছেন, কেউ বা জমি বন্ধক দিচ্ছেন। যদি এই প্রবণতাকে বাধা দেওয়া না হয়, তা'হলে অনিবার্যভাবেই গ্রামাঞ্চলে এই দুই ধরনের বিপরীতমুখী ঝোঁক দিন দিন আরো তীব্রতর হয়ে উঠবে। যে সব কৃষকেরা ভূমি হারিয়েছেন ও যে সব কৃষকেরা দারিদ্র্যের মধ্যে আছেন, তাঁরা আমাদের উপর অভিযোগ

করবেন যে, তাঁদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা কিছুই করছি নে এবং তাঁদের কষ্ট নিবারণের জন্য আমরা কোনো সাহায্য করছি নে। পুঁজিবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এমন অবস্থাপন্ন মাঝারি কৃষকরাও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন, কারণ আমরা যদি পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করতে না চাই তা'হলে আমরা কখনো এই সব কৃষকদের দাবি পূরণ করতে পারবো না। এমন অবস্থায় শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী কি অব্যাহতভাবে সুসম্বদ্ধ থাকতে পারে? স্পষ্টতই তা পারে না। শুধুমাত্র নতুন ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ ক্রমশঃ সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ত্তকরণকে বাস্তবায়িত করার এবং হস্তশিল্প ও পুঁজিবাদী শিল্প বাণিজ্যের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে সমগ্র কৃষির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করতে হবে, অন্য কথায় এর অর্থ হ'ল সমবায়ীকরণ কার্যকরী করা এবং গ্রামাঞ্চলের ধনী কৃষক ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করা, যাতে

গ্রামাঞ্চলের সমস্ত জনগণ এক সঙ্গে অবস্থাপন্ন হয়ে উঠতে পারেন। আমরা মনে করি, শুধু এই ভাবেই শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী সুদৃঢ় করা যায়।

"কৃষিসমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

......সামগ্রিক পরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝাই ৬০ কোটি মানুষের স্বার্থ সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করা। যখন আমরা পরিকল্পনা রচনা করি, কাজ করি কিংবা সমস্যার বিষয় চিন্তা করি, তখন চীন দেশে যে ৬০ কোটি মানুষ আছে—এ কথাটা সর্বদাই আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো মতেই তা ভুলে গেলে চলবে না।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াও আমাদের ৬০ কোটি জনসংখ্যা হচ্ছে একটা নির্ণায়ক উপাদান। বেশী লোকের অর্থ বেশী ধ্যানধারণার আলোড়ন,

বেশী উৎসাহ, বেশী কর্মোদ্যম। জনসাধারণ আজ এত বেশী অনুপ্রাণিত, সংগ্রামে দৃঢ়-সংকল্প এবং সাহসে পরিপূর্ণ যে ইতিপূর্বে তা আর কখনো দেখা যায় নি।

"একটি সমবায়সমিতির পরিচিতি" (১৫ই এপ্রিল, ১৯৫৮)

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও চীনের ৬০ কোটি জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে "দারিদ্র্য ও দাগহীনতা"। এটা দেখতে খারাপ ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু আসলে তা ভাল। দারিদ্র্য পরিবর্তনের আকাংক্ষা জাগায়, কর্মোদ্যম এবং বিপ্লবের প্রেরণা দেয়। কোনো একটা সাদা কাগজে—যার উপর কোনো দাগ নেই—সে কাগজে সবচেয়ে নতুন ও সুন্দর অক্ষর লেখা যায় এবং সবচেয়ে নতুন ও সুন্দর চিত্র অংকন করা যায়।

ঐ

চীন বিপ্লবের দেশব্যাপী জয়লাভ এবং ভূমি-সমস্যার সমাধানের পরেও চীনে তখনো দুই ধরনের মৌলিক দ্বন্দ্ব বর্তমান থাকবে। প্রথমটি আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়টি বৈদেশিক, অর্থাৎ চীন ও সাম্রাজ্য-বাদী দেশসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই কারণে জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়ী হবার পর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র-ক্ষমতা দুর্বল করলে চলবে না বরং তা আরো জোরদার করতে হবে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

"আপনারা কি রাষ্ট্র-ক্ষমতা বিলোপ করতে চান না?"—হ্যাঁ, আমরা চাই; কিন্তু এখন না, আমরা এখনো এটা করতে পারি নে। কেন পারি নে? কারণ সাম্রাজ্যবাদ এখনো বর্তমান, দেশের ভেতর-কার প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী এখনো বর্তমান এবং আমাদের দেশে শ্রেণী এখনো বিদ্যমান। জাতীয় প্রতিরক্ষাকে সুসম্বদ্ধ করার জন্য এবং জনগণের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য আমাদের বর্তমান কর্তব্য

হচ্ছে জনগণের রাষ্ট্র-যন্ত্রকে সুদৃঢ় করা—প্রধানতঃ গণফৌজ, গণ-পুলিশ এবং গণ-আদালতকে শক্তিশালী করা।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের রাষ্ট্র। এই একনায়কত্ব কিসের জন্য? এই একনায়কত্বের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও ব্যক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববিরোধী শোষকদের দমন করা এবং যারা সমাজতান্ত্রিক গঠনকে বানচাল করতে চেষ্টা করে তাদের দমন করা, অর্থাৎ দেশের ভেতরে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা। উদাহরণ স্বরূপ, কোনো কোনো প্রতিবিপ্লবীকে গ্রেফতার করা, বিচার ও শাস্তি দান করা এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের ভোটাধিকার ও বাক-স্বাধীনতা না দেওয়া—এসবই

আমাদের একনায়কত্বের আওতায় পড়ে। সামাজিক শৃংখলা ও ব্যাপক জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য চোর, ঠগ, খুনী, গৃহদাহকারী, গুণ্ডাচক্র ও গুরুতরভাবে সামাজিক শৃংখলা লংঘনকারী অন্যান্য দুর্বৃত্তদের উপরেও একই ভাবে একনায়কত্ব প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এই একনায়কত্বের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে বহির্শত্রুদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ ও সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা। তেমন অবস্থা দেখা দিলে আমাদের ও বহির্শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করাই হচ্ছে একনায়কত্বের কর্তব্য। এই একনায়কত্বের লক্ষ্য হচ্ছে সমস্ত জনগণকে রক্ষা করা, যাতে করে তাঁরা শান্তিতে পরিশ্রম করতে পারেন এবং আমাদের দেশকে আধুনিক শিল্প, আধুনিক কৃষি, আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিসম্পন্ন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রয়োজন। কারণ কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী দূরদর্শী, নিঃস্বার্থ এবং চূড়ান্তভাবে বিপ্লব চালাতে সবচেয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সমগ্র বিপ্লবের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হয়, আর শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব থাকলেই বিপ্লব জয়লাভ করে।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষকশ্রেণী ও শহরের পাতি বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী, মুখ্যতঃ শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী, কারণ এই দুই শ্রেণী চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ। সাম্রাজ্যবাদ এবং কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত করার জন্য এই দুই শ্রেণীই হচ্ছে প্রধান শক্তি। নয়া গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ প্রধানতঃ তাদের মৈত্রীর উপর নির্ভর করে।

ঐ

শ্রেণী সংগ্রাম, উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার তিনটি মহান বিপ্লবী আন্দোলন। এই আন্দোলনগুলি কমিউনিস্টদেরকে আমলাতন্ত্র থেকে মুক্ত করার এবং সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামিবাদের দ্বারা আক্রান্ত না হবার দৃঢ় নিশ্চয়তা বিধান করে, এবং এর ফলে তাঁরা চিরকাল অজেয় হয়েই থাকবেন। সর্বহারাশ্রেণী যে ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে কার্যকরী করতে সক্ষম হবেন, এই তিনটা আন্দোলন হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তা। অন্যথায়, এই আন্দোলনের অবর্তমানে যদি জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, দুষ্কৃতিকারী ও দৈত্যদানবদের সকলকে বের হয়ে আসতে দেওয়া হয়, অথচ আমাদের কেডারগণ যদি এ সবের দিকে দৃষ্টিপাত না করেন, এমন কি তাঁদের মধ্যে অনেকে শত্রুর সঙ্গে আমাদের নিজদের পার্থক্য নির্ণয় না করে তার সঙ্গে যোগসাজশ করেন, শত্রুর দ্বারা কলুষিত, বিভক্ত ও নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়েন এবং

আমাদের কেডারদের বাইরে টেনে নেওয়া হয় অথবা শত্রু আমাদের মধ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয় এবং শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের অনেককে যদি শত্রুর নরম ও কঠোর ফন্দীফিকিরের মুখে অরক্ষিত অবস্থায় পড়তে হয়—যদি এমনি হয়, তা'হলে অনিবার্যভাবেই দেশব্যাপী প্রতিবিপ্লবী ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হতে বেশী সময় লাগবে না—খুব কম হলে সম্ভবতঃ মাত্র কয়েকটা বছর বা দশ বছর সময় লাগবে, আর খুব বেশী হলে কয়েক দশক বছর লাগবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি নিশ্চয়ই একটা সংশোধনবাদী পার্টি, ফ্যাসিস্ট পার্টিতে পরিণত হবে, আর গোটা চীনের রঙ যাবে বদলে।

"খ্রুশ্চভের মেকী কমিউনিজম ও বিশ্বের জন্য তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে" থেকে উদ্ধৃত (১৪ই জুলাই, ১৯৬৪)

জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব দু'টি পদ্ধতি প্রয়োগ করে। শত্রুর প্রতি এটা একনায়কত্বের

পদ্ধতি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত দরকার এই একনায়কত্ব তাদেরকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করতে দেয় না, জনগণের সরকারের আইন মানতে, পরিশ্রম করতে বাধ্য করে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে। অপরপক্ষে, জনগণের প্রতি এই একনায়কত্ব কোনো বাধ্যবাধকতার পদ্ধতি প্রয়োগ করে না, প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের পদ্ধতি, অর্থাৎ অবশ্যই তাঁদেরকে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে দেয় এবং তাঁদেরকে এটা বা ওটা করতে বাধ্য না ক'রে বরং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁদেরকে শিক্ষা দেয় এবং বুঝায়।

চীন গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত সমাপ্তি ভাষণ (২৩শে জুন, ১৯৫০)

আরো দৃঢ় ভিত্তিতে চীনের সমাজতান্ত্রিক কার্যের দ্রুত বিকাশের জন্য চীনা জনগণ কমিউনিস্ট

পার্টির নেতৃত্বে একটা প্রাণবন্ত শুদ্ধিকরণ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। এটা হ'লো দেশব্যাপী একটা বিতর্ক অনুষ্ঠানের আন্দোলন—এই বিতর্ক একাধারে পরিচালিতও বটে, স্বাধীনও বটে; শহর ও গ্রাম এই উভয় অঞ্চলেই অনুষ্ঠিত এই বিতর্ক হলো সমাজ-তান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী পথ দু'টি সম্পর্কে, রাষ্ট্রের মৌলিক ব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে, পার্টি ও সরকারের কর্মীদের কর্মরীতি এবং জনগণের কল্যাণ প্রভৃতি প্রশ্ন সম্পর্কে; তথ্য পেশ করে যুক্তি দিয়ে বলার পদ্ধতিতে এই বিতর্ক চালানো হয়, যাতে করে জনগণের ভেতরকার যে সব বাস্তব দ্বন্দ্বের আশু মীমাংসা প্রয়োজন তা নির্ভুলভাবে করা যায়। এটা হলো জনগণের সমাজতান্ত্রিক আত্মশিক্ষার ও আত্মপুনর্গঠনের আন্দোলন।

"মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

আমাদের সামনে রয়েছে মহান গঠন কার্য সম্পন্ন করার সবচেয়ে দুরূহ কর্তব্য। যদিও আমাদের পার্টির সভ্য-সংখ্যা এক কোটিরও বেশী তবুও দেশের জনসংখ্যার তুলনায় তাঁরা খুবই সংখ্যালঘু। আমাদের বিভিন্ন সরকারী বিভাগে ও বিভিন্ন গণসংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের বহু কাজেই পার্টি-বহির্ভূত লোকদের উপর নির্ভর করতে হয়। আমরা যদি জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে এবং পার্টি-বহির্ভূত লোকদের সাথে সহযোগিতা করতে নিপুণ না হই, তা'হলে ভাল ভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা অসম্ভব। গোটা পার্টির ঐক্যকে দৃঢ় করার কাজ অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্ত জাতি, গণতান্ত্রিক শ্রেণী, গণতান্ত্রিক পার্টি ও জনগণের সংগঠনের ঐক্যকে অব্যাহতভাবে সুদৃঢ় করে তুলতে হবে এবং জনগণের গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টকে অব্যাহতভাবে সুসম্বদ্ধ ও সম্প্রসারিত করতে হবে, পার্টি ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর যে কোনোরূপ অস্বাস্থ্যকর অভিব্যক্তি আমাদের

কাজের যে কোনো অংশের ভেতরে দেখা দিলে, আমরা অবশ্যই সচেতনভাবে তা দূরীভূত করব।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

৪. জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসা

আমাদের সামনে দুই ধরনের সামাজিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সেগুলি হলো আমাদের ও শত্রুদের মধ্য-কার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব—এই দু'টি ভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হ'লে আমাদের প্রথমে অবশ্যই বুঝতে হবে "জনগণ" বলতে কি বুঝায়

এবং "শত্রু" বলতে কি বুঝায়। ...... বর্তমান পর্যায়ে, সমাজতন্ত্র গঠনের সময়ে যে সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও সামাজিক গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য অনুমোদন করে, সমর্থন করে এবং তাতে যোগদান করে, তারাই জনগণের আওতায় পড়ে; আর যে সমস্ত সামাজিক শক্তি ও সামাজিক গোষ্ঠী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিরোধ করে, সমাজতান্ত্রিক গঠনের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয় এবং তা বানচাল করার কাজে লিপ্ত হয়, তারাই জনগণের শত্রু।

ঐ

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলোর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরকার দ্বন্দ্ব, কৃষকদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, বুদ্ধিজীবীদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকশ্রেণী এই দুই-এর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, একদিকে শ্রমিক ও কৃষক এবং অপরদিকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, একদিকে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণ এবং অপরদিকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব, জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভেতরকার দ্বন্দ্ব, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের জনগণের সরকার সত্যিকারভাবে জনগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনগণের সেবা করে; তবুও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোনো না কোনো দ্বন্দ্ব আছে। এই ধরনের দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে রাষ্ট্র-স্বার্থ, যৌথ স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব, পরিচালক ও পরিচালিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কোনো কোনো কর্মচারীর আমলাতান্ত্রিক রীতি ও জনসাধারণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব। এই সব দ্বন্দ্বও জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণভাবে বলতে গেলে, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলির মূলে রয়েছে জনগণের স্বার্থের মৌলিক একত্ব।

ঐ

আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে বৈরী দ্বন্দ্ব। জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, মেহনতী মানুষের মধ্যকার দ্বন্দ্ব হলো অবৈরী দ্বন্দ্ব; আর

শোষিত শ্রেণী ও শোষক শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্বসমূহে বৈরী দিক ছাড়া অবৈরী দিকও রয়েছে।

ঐ

আমাদের দেশের জনগণের রাজনৈতিক জীবনে কোন ব্যক্তির কথায় ও কাজে কোনটা ভুল আর কোনটা নির্ভুল তার মধ্যে কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত? আমরা মনে করি, আমাদের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি অনুসারে, আমাদের দেশের জনগণের বিরাট সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা অনুসারে এবং আমাদের দেশের রাজনৈতিক পার্টি ও গ্রুপগুলো কর্তৃক বারংবার বিঘোষিত অভিন্ন রাজনৈতিক অভিমত অনুসারে এই মানদণ্ড মোটামুটি নিম্নরূপ :

(১) কথা ও কাজ গোটা দেশের বিভিন্ন জাতির জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করা উচিত, বিভক্ত করতে নয়;

(২) সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে ও সমাজতান্ত্রিক গঠনের পক্ষে তা হিতকর হওয়া উচিত, ক্ষতিকর নয়;

(৩) জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বকে সুসম্বদ্ধ হতে তার সাহায্য করা উচিত, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল করা নয়;

(৪) গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে সুসম্বদ্ধ হতে তার সাহায্য করা উচিত, তাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা দুর্বল করা নয়;

(৫) কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে সুসম্বদ্ধ হতে তার সাহায্য করা উচিত, তাকে প্রত্যাখ্যান করা বা দুর্বল করা নয়;

(৬) সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক ঐক্যের এবং সারা দুনিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণের আন্তর্জাতিক ঐক্যের পক্ষে তা হিতকর হওয়া উচিত, ক্ষতিকর নয়।

এই ছয়টি মানদণ্ডের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক পথ ও পার্টির নেতৃত্ব।

ঐ

প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার প্রশ্নটি হলো আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সংগ্রামের

সমস্যা। জনগণের ভেতরে কোনো কোনো লোক এই সমস্যাটা কিছুটা ভিন্নভাবে দেখেন। দুই ধরনের লোকের মতামত আমাদের থেকে ভিন্ন। দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার লোকেরা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন না এবং শত্রুকে আমাদের নিজেদের লোক বলে ধরে নেন। ব্যাপক জনসাধারণ যাদের শত্রু ব'লে মনে করেন ঠিক তাদেরকেই তাঁরা বন্ধু ব'লে মনে করেন। ''বাম''পন্থী চিন্তাধারার লোকেরা আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে এমন পরিমাণে অতিরঞ্জিত করে তোলেন যে, তাঁরা জনগণের ভেতরকার কোনো কোনো দ্বন্দ্বকে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বলে ধরে নেন এবং কোনো কোনো লোক যাঁরা আসলে প্রতিবিপ্লবী নন তাঁদেরকেও তাঁরা প্রতিবিপ্লবী মনে করেন। এই দু'টি মতই ভুল; এ দু'য়ের কোনোটাই প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার সমস্যার সঠিক মীমাংসা করতে পারে না এবং

প্রতিবিপ্লবীদের নির্মূল করার কাজের নির্ভুল মূল্যায়নও করতে পারে না।

ঐ

গুণগতভাবে ভিন্ন দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান কেবল-মাত্র গুণগতভাবে ভিন্ন পদ্ধতির দ্বারাই করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যকার দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; উপনিবেশসমূহ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব কৃষির যৌথীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণের পদ্ধতির দ্বারা সমাধান করা হয়; কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার পদ্ধতির দ্বারা মীমাংসা করা হয়; সমাজের ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব উৎপাদন-শক্তির বিকাশ সাধনের দ্বারা মীমাংসা

করা হয়। ...... ভিন্ন দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য ভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এমন একটা মূলনীতি যা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের অবশ্যই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ভিন্ন হওয়ার ফলে মীমাংসার পদ্ধতিও ভিন্ন হতেই হবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পূর্বেরটা হচ্ছে আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য টানার ব্যাপার এবং পরেরটা হচ্ছে নির্ভুল ও ভুলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানার ব্যাপার। সত্য বটে, আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার পার্থক্যও নির্ভুল ও ভুলের প্রশ্ন। উদাহরণ স্বরূপ, সাম্রাজ্য-বাদী, সামন্তবাদী ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী—এই সব আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং আমাদের মধ্যে কে নির্ভুল, কে ভুল, এটাও হচ্ছে নির্ভুল ও ভুলের প্রশ্ন, কিন্তু জনগণের ভেতরকার নির্ভুল ও ভুলের প্রশ্নের প্রকৃতি থেকে এটা ভিন্ন ধরনের।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

যে কোনো মতাদর্শগত সমস্যার এবং জনগণের ভেতরকার বিতর্কমূলক সমস্যার মীমাংসা কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেই করা যায়, কেবলমাত্র আলোচনা, সমালোচনা, বুঝিয়ে বলা ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রয়োগ করে করা যায়, বাধ্য করার ও চাপ দেবার পদ্ধতিতে নয়।

ঐ

উৎপাদন ও অধ্যয়ন কার্যকরীভাবে চালিয়ে যেতে সমর্থ হবার জন্য এবং জীবনকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করার জন্য জনগণ দাবি করেন যে, তাঁদের নিজেদের সরকার এবং উৎপাদন-পরিচালক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহের পরিচালকরা বাধ্যতামূলক প্রকৃতির বিবিধ উপযুক্ত প্রশাসনিক নির্দেশ জারী

করুন। এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, এই রূপ প্রশাসনিক নির্দেশ ছাড়া সামাজিক শৃংখলা বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রশাসনিক নির্দেশ এবং জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব মীমাংসার ব্যাপারে বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষা দেবার পদ্ধতি অনুসরণ করা পরস্পরের পরিপূরক। সামাজিক শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে জারীকৃত প্রশাসনিক নির্দেশের সাথে সাথে বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও অবশ্যই থাকতে হবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রশাসনিক নির্দেশের উপর নির্ভর করলে কাজ হবে না।

ঐ

বুর্জোয়াশ্রেণী ও পাতি বুর্জোয়াশ্রেণী অবশ্যই তাদের নিজস্ব মতাদর্শ প্রকাশ করবে। অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রশ্নে তারা নিজদেরকে সম্ভাব্য সব রকমে একগুঁয়ের মতো প্রকাশ করবে। তারা অন্যরকম করবে এমনটা আশা করা যায় না। দমনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদেরকে আত্মপ্রকাশ করতে না দেওয়া আমাদের উচিত নয়, বরং তাদের তা করতে দেওয়া উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হওয়া ও তাদের যথাযোগ্য সমালোচনা করা উচিত। নিঃসন্দেহে, আমরা নানা প্রকারের ভ্রান্ত চিন্তাধারার সমালোচনা অবশ্যই করবো। সমালোচনা না করা ও সর্বত্র ভ্রান্ত চিন্তাধারা অবাধে ছড়িয়ে পড়তে দেখা এবং তাদের একচ্ছত্র হয়ে উঠতে দেওয়া কোনক্রমেই চলবে না। ভুলের সমালোচনা অবশ্যই করতে হবে এবং বিষাক্ত আগাছা যেখানেই দেখা দিক সেখানেই তার বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা গোঁড়ামিপূর্ণ হওয়া উচিত নয়, তাতে আধিবিদ্যক পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত নয় বরং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা উচিত। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসউৎপাদক যুক্তি।

ঐ

জনগণের ত্রুটির সমালোচনা করা প্রয়োজন, ... কিন্তু তা করতে গিয়ে আমাদেরকে

অবশ্যই সত্যি সত্যি জনগণের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং তাঁদেরকে রক্ষা এবং শিক্ষিত করার জন্য প্রাণঢালা আগ্রহের সাথে কথা বলতে হবে। কমরেডদের সঙ্গে শত্রুদের মতো ব্যবহার করার অর্থ শত্রুদের পক্ষে চলে যাওয়া।

"সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম হচ্ছে সর্বব্যাপী ও ধ্রুব। কিন্তু দ্বন্দ্বের মীমাংসার পদ্ধতি, অর্থাৎ সংগ্রামের রূপ, দ্বন্দ্বের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য ভিন্নতর হয়। কোনো কোনো দ্বন্দ্বে রয়েছে প্রকাশ্য বৈরিতা, অন্যগুলোতে তা নেই। বস্তুর নির্দিষ্ট বিকাশানুসারে কোনো কোনো দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল অবৈরী কিন্তু পরে তা বৈরী দ্বন্দ্বে বিকাশলাভ করে; আবার কোনো কোনো দ্বন্দ্ব যা শুরুতে ছিল বৈরী কিন্তু পরে তা অবৈরী দ্বন্দ্বে বিকাশ লাভ করে।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

সাধারণ অবস্থায়, জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্ব বৈরী নয়। কিন্তু এগুলো যদি যথাযথভাবে মীমাংসিত না হয় অথবা আমরা যদি সতর্কতা শিথিল করি কিংবা উদাসীন হই, তা'হলে বৈরিতার উদ্ভব হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের অবস্থা সাধারণতঃ কেবলমাত্র আংশিক এবং ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং জনগণের স্বার্থও মূলতঃ একই।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমাদের দেশে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলছে, সাধারণভাবে বলতে গেলে, তা হচ্ছে জনগণের ভেতরকার শ্রেণীসংগ্রাম, কারণ, আমাদের দেশের জাতীয়

বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বৈত চরিত্রের। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে এই শ্রেণীর চরিত্রে একটা বিপ্লবী দিক ছিল এবং একটা আপোষমূলক দিকও ছিল। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সময়ে তার চরিত্রের একটা দিক হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করে মুনাফা অর্জন করা, আর শাসনতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ও সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মেনে নেওয়ার ইচ্ছা হলো আর একটি দিক। সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার শ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ভিন্ন রকমের। শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব হচ্ছে শোষক ও শোষিতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব; স্বভাবতঃই এটা বৈরী দ্বন্দ্ব। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থায় যদি এই দু'শ্রেণীর বৈরী দ্বন্দ্ব যথাযথভাবে মীমাংসিত হয়, তা'হলে তাকে অবৈরী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করা সম্ভব এবং শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সম্ভব। যদি আমরা যথাযথভাবে এর মীমাংসা না করি এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐক্য, সমালোচনা ও শিক্ষাদানের নীতি অবলম্বন

না করি অথবা যদি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী আমাদের এই নীতি গ্রহণ না করে, তা'হলে শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব আমাদের ও শত্রুদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিবর্তিত হবে।

ঐ

সমাজতান্ত্রিক দেশের ভেতরকার প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজশে জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে তাদের চক্রান্তমূলক উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে অনৈক্যের ও মতভেদের উস্কানি দেয় এবং বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। ১৯৫৬ সালে সংঘটিত হাঙ্গেরীর ঘটনার এই শিক্ষার প্রতি সকলের নজর দেওয়া উচিত।

ঐ

৫. যুদ্ধ ও শান্তি

শ্রেণী ও শ্রেণীর মধ্যে, জাতি ও জাতির মধ্যে, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের মধ্যে, রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকশিত হয়ে উঠে, তখন সে দ্বন্দ্বগুলোর মীমাংসার জন্য সংগ্রামের উচ্চতম রূপই হচ্ছে যুদ্ধ; এর শুরু হয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও শ্রেণীর উদ্ভবকাল থেকে।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা"
(ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

"যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ"। এই অর্থে যুদ্ধ হচ্ছে রাজনীতি এবং যুদ্ধের ঘটনাটা রাজনৈতিক কার্যকলাপ। প্রাচীনকাল থেকে শুরু

করে এমন একটি যুদ্ধও ঘটে নি, যার কোনো রাজনৈতিক চরিত্র ছিল না।......

কিন্তু যুদ্ধের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে এবং সেই হিসেবে যুদ্ধকে সাধারণভাবে রাজনীতির সমান করে বিচার করা যায় না। "যুদ্ধ হচ্ছে অন্য উপায়ে রাজনীতির ধারাবাহিক রূপ"। রাজনীতি যখন একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে বিকাশ লাভ করে এবং আগের মতো সাধারণ প্রচলিত উপায়ে আর অগ্রসর হতে পারে না, তখন যুদ্ধ বেধে ওঠে এবং তা রাজনৈতিক পথের বাধাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেয়।...... বাধা যখন দূর করা হবে এবং রাজনৈতিক লক্ষ্য যখন অর্জিত হবে, তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বাধা পুরোপুরিভাবে দূর না হলে, যুদ্ধ অব্যাহতগতিতে চালিয়ে যেতেই হবে যতক্ষণ না লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়।...... অতএব, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রাজনীতি হচ্ছে রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হচ্ছে রক্তপাতময় রাজনীতি।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

ইতিহাসে দেখা যায় যুদ্ধ দুই প্রকারের, ন্যায় যুদ্ধ আর অন্যায় যুদ্ধ। যে সব যুদ্ধ প্রগতিশীল সে সবই ন্যায় যুদ্ধ, আর যে সব যুদ্ধ প্রগতিতে বাধা দেয় সে সবই হচ্ছে অন্যায় যুদ্ধ। প্রগতিকে ব্যাহত করে যে সব অন্যায় যুদ্ধ, আমরা কমিউনিস্টরা সে সবেরই বিরোধিতা করি, কিন্তু প্রগতিশীল ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করি না। আমরা কমিউনিস্টরা, ন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা তো করিই নে, বরং সে সব যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ হলো অন্যায় যুদ্ধের একটা উদাহরণ; এই যুদ্ধে দু'পক্ষই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের খাতিরে লড়লো, তাই সারা দুনিয়ার কমিউনিস্টরা দৃঢ়ভাবে এই যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। এমন একটা যুদ্ধের বিরোধিতা করার পদ্ধতি হচ্ছে যুদ্ধ বেধে উঠার আগেই তাকে বাধাদানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা; আর যুদ্ধ বেধে উঠার পর যথাসম্ভব যুদ্ধ দিয়ে যুদ্ধের বিরোধিতা করা, ন্যায় যুদ্ধ দিয়ে অন্যায় যুদ্ধের বিরোধিতা করা।

ঐ

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য; যুদ্ধকে বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব, আর সেজন্য জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করাও অসম্ভব।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে একটা বিষ-প্রতিষেধক; এ যে শুধু শত্রুদের বিষ নাশ করে তাই নয় উপরন্তু তা আমাদের নিজদেরকেও ক্লেদ থেকে মুক্ত করে। প্রতিটি ন্যায়, বিপ্লবী যুদ্ধ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং তা বহু বস্তুকে রূপান্তরিত করতে পারে অথবা তাদের রূপান্তরের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারে। চীন-জাপান যুদ্ধ চীন-জাপান উভয় দেশকেই রূপান্ত-রিত করবে; প্রতিরোধ যুদ্ধে এবং যুক্ত ফ্রণ্টে চীন যদি অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকে, তা'হলে পুরানো জাপান নিশ্চয়ই এক নতুন জাপানে এবং পুরানো চীন এক নতুন চীনে পরিণত হবে; আর চীন-

জাপান উভয় দেশের লোক এবং সকল বস্তুই এই যুদ্ধ চলা কালে ও এই যুদ্ধের পরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

প্রতিটি কমিউনিস্টকে অবশ্যই এ সত্য বুঝতে হবে: "বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা বেরিয়ে আসে"।

"যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" (৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮)

বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য ও সর্বোচ্চ রূপ হচ্ছে সশস্ত্র শক্তির দ্বারা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা, যুদ্ধের দ্বারা সমস্যার সমাধান করা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই বিপ্লবী নীতি সর্বত্রই প্রযোজ্য, তা চীন দেশেই হোক আর অন্য যেকোন দেশেই হোক।

ঐ

চীন দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া সর্বহারাশ্রেণী, জনগণ, কমিউনিস্ট পার্টি কেউই স্থান পাবে না এবং বিপ্লবে জয়লাভ করাও সম্ভব হবে না। আঠারো বছর (পার্টি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে নিয়ে) ধরে আমাদের পার্টির বিকাশ, সুসম্বদ্ধতা ও বলশেভিকীকরণ বিপ্লবী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে, সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি আজ যা হয়েছে তা হতে পারত না। রক্তের বিনিময়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি, গোটা পার্টির কমরেডগণ কিছুতেই তা কখনো ভুলে যাবেন না।

"'কমিউনিস্ট' পত্রিকার প্রকাশনা সম্পর্কে" (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৯)

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সৈন্যবাহিনী হচ্ছে রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রধান উপাদান। যিনি রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে চান এবং সেটা বজায় রাখতে চান, তাঁর অবশ্যই একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী থাকতে হবে। কেউ কেউ আমাদেরকে "যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা"

তত্ত্বের প্রবক্তা বলে বিদ্রূপ করে। হ্যাঁ, আমরা বিপ্লবী যুদ্ধের সর্বশক্তিমত্তা-তত্ত্বের প্রবক্তা তা ঠিক। এটা খারাপ নয়, ভালই; এটা মার্কসবাদী। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বন্দুকই একটা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি করেছিল। আমরা একটা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করবো। সাম্রাজ্যবাদের যুগে শ্রেণীসংগ্রামের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে: শুধুমাত্র বন্দুকের শক্তিতেই শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনসাধারণ সশস্ত্র বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের পরাজিত করতে পারেন; এই অর্থে আমরা বলতে পারি যে, শুধুমাত্র বন্দুক দিয়েই সমগ্র দুনিয়ার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব।

"যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" (৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮)

যুদ্ধ বিলোপ করার আমরা সমর্থক, আমরা যুদ্ধ চাই না; কিন্তু কেবলমাত্র যুদ্ধের মাধ্যমেই যুদ্ধ বিলোপ করা যায় এবং বন্দুক থেকে মুক্তি পাবার জন্য বন্দুক ধারণ করা অবশ্য প্রয়োজন।

ঐ

যুদ্ধ—মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক হত্যার এই দানব—মানব সমাজের অগ্রগতির ফলে শেষ পর্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা ঘটবে। কিন্তু তাকে ধ্বংস করার কেবল একটি মাত্র পদ্ধতি আছে, তা হচ্ছে, যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিরোধিতা করা, বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা, জাতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা জাতীয় প্রতি-বিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং শ্রেণীর বিপ্লবী যুদ্ধের দ্বারা শ্রেণীর প্রতিবিপ্লবী যুদ্ধের বিরোধিতা করা। ...... মানব সমাজ যখন এগিয়ে গিয়ে এমন একটা স্তরে পেঁছিবে যখন শ্রেণী ও রাষ্ট্র লোপ পাবে, তখন আর কোনো যুদ্ধ থাকবে না, প্রতিবিপ্লবী বা বিপ্লবী, অন্যায় বা ন্যায়, কোনো যুদ্ধই থাকবে না; মানবজাতির পক্ষে সেটা হবে চিরস্থায়ী শান্তির যুগ। বিপ্লবী যুদ্ধের নিয়ম সম্পর্কে আমাদের গবেষণার প্রেরণা এসেছে সমস্ত যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ইচ্ছা থেকে; এর মধ্যেই নিহিত

রয়েছে আমাদের, অর্থাৎ কমিউনিস্টদের সঙ্গে সকল শোষক শ্রেণীর পার্থক্য।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা"
(ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

আমাদের দেশ এবং অন্যান্য সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ শান্তি চায়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনগণও তাই চান। যুদ্ধের জন্য লালায়িত এবং শান্তি চায় না কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক সাম্রাজ্যবাদী দেশের কতকগুলো একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠী, যারা মুনাফার জন্য আগ্রাসী হামলার উপর নির্ভর করে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বশান্তি অর্জনের জন্য সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরের ভ্রাতৃপ্রতিম দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের মৈত্রী ও সহযোগিতা আরো প্রসারিত করতে হবে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলোর সঙ্গে

আমাদের ঐক্যকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। আমাদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায় এই রকম সকল দেশের সঙ্গে ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক মর্যাদা দানের এবং সমানাধিকার ও পারস্পরিক সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমা-দের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সমস্ত দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনের প্রতি এবং দুনিয়ার সকল দেশের শান্তি আন্দোলন ও ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি আমাদের অবশ্যই সক্রিয় সমর্থন দিতে হবে।

ঐ

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সম্পর্কে বক্তব্য হলো, আমাদের সেখানকার জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সেই দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থা-নের চেষ্টা করতে হবে, তাদের সাথে ব্যবসায় করতে হবে, সম্ভাব্য যে কোনো যুদ্ধকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু কোনো মতেই তাদের

সম্পর্কে কোনো রূপ অবাস্তব ধারণা পোষণ করা আমাদের উচিত নয়।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমরা শান্তি কামনা করি। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যদি যুদ্ধ করতে জেদ ধরে, তা'হলে আমরা অটল সংকল্প নিয়ে একেবারে শেষ অবধি যুদ্ধ করেই গঠনকার্য আরম্ভ করবো, এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। প্রতিদিন যুদ্ধের ভয় করতে থাকলে, যুদ্ধ এসে গেলে আপনার উপায় কি হবে? প্রথমে আমি বলেছিলাম, পূর্ব বায়ু পশ্চিম বায়ুকে দাবিয়ে রাখছে, যুদ্ধ বাধবে না, আর এখন আমি যুদ্ধ বেধে গেলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সে সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাগুলো জুড়ে দিয়েছি। এই দু'ধরনের সম্ভাবনার কথাই বিবেচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকদের পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

দুনিয়ার সকল দেশের মানুষ এখন আলোচনা করছে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধবে কি না। এ প্রশ্নেও আমাদের অবশ্যই মনের দিক থেকে প্রস্তুত হতে হবে, তার বিশ্লেষণও করতে হবে। আমরা দৃঢ়ভাবে শান্তির পক্ষে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীরা যদি যুদ্ধ বাধাবার জন্য জেদ ধরে, তাহ'লে আমাদের তাতে ভয় পাওয়া উচিত নয়। যে কোনো "বিশৃংখলা" সম্পর্কে আমাদের যে মনোভাব, এ প্রশ্ন সম্পর্কেও আমাদের সেই একই মনোভাব: প্রথমতঃ, আমরা এর বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়তঃ, আমরা একে ভয় করি নে। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পরেই জন্মলাভ করেছিল বিশ কোটি মানুষের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরে নব্বুই কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয় ঘটেছিল। যদি সাম্রাজ্যবাদীরা তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ বাধাতে জেদ ধরে, তা'হলে এটা নিশ্চিত যে, আরো বহু কোটি লোক সমাজতন্ত্রের পক্ষে চলে আসবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য পৃথিবীতে আর বেশী স্থান অবশিষ্ট থাকবে না; এটাও সম্ভব

যে, সাম্রাজ্যবাদের গোটা কাঠামোটাই পুরোপুরি ধ্বসে পড়বে।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

গোলযোগের সৃষ্টি করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার গোলযোগের সৃষ্টি করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, সর্বনাশ না হওয়া পর্যন্ত এমনিই চলবে—এটাই হচ্ছে জনগণের কার্যের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের এবং বিশ্বের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের আচরণের যুক্তি এবং কোনো দিনই তারা এ যুক্তি লংঘন করবে না। এটা হচ্ছে একটা মার্কসবাদী নিয়ম। যখন আমরা বলি "সাম্রাজ্যবাদ খুবই হিংস্র" তখন আমরা বুঝাই যে, ওদের স্বভাব কখনো বদলাবে না, সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ধ্বংস অবধি তাদের কসাইয়ের ছুরি কখনো ছাড়বে না, কখনো তারা বুদ্ধদেব হবে না।

সংগ্রাম করা, ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, আবার ব্যর্থ হওয়া, আবার সংগ্রাম করা, বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এমনিই চলবে—এটাই হচ্ছে জনগণের যুক্তি, তাঁরাও কখনো এই যুক্তি লংঘন করবেন না। এটা আর একটা মার্কসবাদী নিয়ম। রাশিয়ার জনগণের বিপ্লব এই নিয়ম অনুসরণ করেছিল, চীনা জনগণের বিপ্লবও তাই করছে।

"মোহ ত্যাগ করো, সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও" (১৪ই আগষ্ট, ১৯৪৯)

আমরা জয়লাভ করেছি বলেই সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পদলেহী কুকুরদের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্কতাকে আমরা কোনো মতেই শিথিল করতে পারি নে। কেউ এই সতর্কতা শিথিল করলে সে রাজনীতিগতভাবে নিজকে নিরস্ত্র করে ফেলবে এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় নিয়ে ফেলবে।

"নয়া রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রস্তুতি কমিটিতে প্রদত্ত ভাষণ" (১৫ই জুন, ১৯৪৯)

সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের পদলেহী কুকুর চীনা প্রতিক্রিয়াশীলরা চীনের এই ভূমিতে আপনা থেকে পরাজয় মেনে নেবে না। তারা পারস্পরিক যোগসাজশে সম্ভাব্য সকল উপায়ে চীনা জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে থাকবে। যেমন ধরুন, বিভেদ ও গোলযোগ সৃষ্টি করার জন্য তারা তাদের দালালদের চীনের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। এটা নিশ্চিত, তারা কখনো এ কাজগুলো ভুলে যাবে না। আর একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক, সাম্রাজ্যবাদীরা চীনা প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানি দিয়ে, এমন কি তাদের নিজেদের শক্তি নিয়োগ করে চীনা সামুদ্রিক বন্দরগুলো অবরোধ করবে। যতদিন পর্যন্ত এমনটা করা সম্ভব ততদিন তারা এমনি করবে। অধিকন্তু, যদি তারা কোনো দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য লালায়িত হয়, তা'হলে তারা চীনের সীমান্তে আক্রমণ ও উপদ্রব করার জন্য কিছু কিছু সৈন্যদল প্রেরণ করবে; এটাও অসম্ভব নয়। এ সব বিষয়কে আমাদের অবশ্যই পূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে।

ঐ

পৃথিবী এগিয়ে চলছে, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, ইতিহাসের এই সাধারণ প্রবণতাকে কেউই বদলাতে পারবে না। আমাদের অবশ্যই বিশ্ব-অগ্রগতির অবস্থা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সর্বদা প্রচার চালাতে হবে, যাতে বিজয়ের উপর জনগণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে"
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের সমস্ত কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের নিজদের সংগ্রামী মনোবলকে কখনো বিন্দুমাত্র শিথিল করা উচিত নয়; সংগ্রামী মনোবলকে শিথিল করার ও শত্রুকে ছোট করে দেখার যে কোনো চিন্তাই ভুল।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

৬. সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা কাগুজে বাঘ

সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই কাগুজে বাঘ। প্রতিক্রিয়াশীলরা দেখতে ভয়াবহ, কিন্তু বাস্তবে তারা তত শক্তিশালী নয়। দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে প্রতিক্রিয়াশীলরা নয়, জনগণই প্রকৃতপক্ষে প্রবল শক্তির অধিকারী।

"মার্কিন সাংবাদিকা আনা লুই স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ" (আগষ্ট, ১৯৪৬)

পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু নেই যা দ্বৈত-প্রকৃতিবিশিষ্ট নয় (এটা হ'ল বিপরীতের একত্বের

নিয়ম); সাম্রাজ্যবাদ এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাও দ্বৈত-প্রকৃতিবিশিষ্ট, তারা একই সঙ্গে প্রকৃত বাঘ ও কাগুজে বাঘ উভয়ই। ইতিহাসে ক্রীতদাসের মালিক শ্রেণী, সামন্ত জমিদারশ্রেণী এবং বুর্জোয়া-শ্রেণী শাসন-ক্ষমতা দখলের পূর্বে ও পরে কিছুদিন প্রাণবন্ত, বিপ্লবী এবং প্রগতিশীল ছিল, তারা তখন প্রকৃত বাঘই ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বিপরীত পক্ষ, অর্থাৎ ক্রীতদাস শ্রেণী, কৃষকশ্রেণী এবং সর্বহারাশ্রেণী ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং অধিক থেকে অধিকতর তীব্রভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলো, ফলে এই শাসক শ্রেণীগুলি ধাপে ধাপে বিপরীতে পরিবর্তিত হলো—প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠীতে, পশ্চাৎপদ মানুষে ও কাগুজে বাঘে পরিবর্তিত হলো; অবশেষে জনগণ হয় তাদের উচ্ছেদ করে ফেলেছে নয়তো করে ফেলবে। জনগণের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশেষ জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়েও প্রতিক্রিয়াশীল, পশ্চাৎপদ এবং ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলো তাদের এই দ্বৈত-প্রকৃতি বজায় রেখেছে। একদিকে তারা প্রকৃত বাঘই, তারা মানুষ খায়, লক্ষ

লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে ভক্ষণ করে। জনগণের সংগ্রামকে অনেক দুরূহ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে, অনেক আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। চীন দেশে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন ধ্বংস করার জন্য চীনা জনগণের এক শ' বছরেরও বেশী সময় লেগেছিল, প্রায় কয়েক কোটি মানুষের প্রাণ বলি দিতে হয়েছিল, শুধু তার পরেই ১৯৪৯ সালে বিজয়লাভ হয়েছে। লক্ষ্য করুন! এরা কি জ্যান্ত বাঘ, লোহার বাঘ এবং প্রকৃত বাঘ ছিল না? কিন্তু পরিশেষে তারা কাগুজে বাঘে, মৃত বাঘে এবং বড়ির বাঘে পরিবর্তিত হয়েছে। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক তথ্য। মানুষ কি এ সব তথ্য দেখে নি বা শোনে নি? বাস্তবিকই এই ধরনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বাস্তব তথ্য রয়েছে। সুতরাং বিষয়ের সারবস্তুকে বিবেচনা করে, দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রণনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা আসলে যা তাদেরকে সেইভাবে অর্থাৎ কাগুজে বাঘ হিসেবেই দেখতে হবে। এর

উপরই আমাদের রণনীতিগত চিন্তাধারা গড়ে তোলা উচিত। অপর দিকে, তারা জ্যান্ত, লৌহ-নির্মিত এবং প্রকৃত বাঘও বটে; এরা মানুষ খায়। এর উপরই আমাদের রণকৌশলগত চিন্তাধারা গড়ে তোলা উচিত।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর উছাং অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ (১লা ডিসেম্বর, ১৯৫৮)

আমি বলেছিলাম যে, শক্তিশালী প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে যারা খ্যাত তাদের সকলেই কেবল কাগুজে বাঘই। কারণ তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। লক্ষ্য করুন, হিটলার কি কাগুজে বাঘ ছিল না? হিটলারকে কি উচ্ছেদ করা হয় নি? আমি আরো বলেছিলাম, রাশিয়ার জার, চীনের সম্রাট এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদ সকলেই ছিল কাগুজে বাঘ। আমরা এখন জানি, তাদের সকলকেই উচ্ছেদ করা হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এখনো উচ্ছেদ ঘটে নি এবং এর হাতে আণবিক বোমা আছে;

আমি বিশ্বাস করি, এরও উচ্ছেদ ঘটবে, সেও একটা কাগুজে বাঘ।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকদের পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

"নিজেরই পায়ের উপর ফেলে দেবার জন্যই কেবল পাথর তুলে নেওয়া", কোনো কোনো নির্বোধ লোকের আচরণের বর্ণনার জন্য এটা হচ্ছে চীনের একটা প্রচলিত প্রবাদ। সকল দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরাই এই রকম নির্বোধ। বিপ্লবী জনগণের উপর তাদের নানা প্রকারের অত্যাচার, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, কেবল আরো ব্যাপক ও আরো তীব্র গণ-বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে। রাশিয়ার জার ও চিয়াং কাই-শেক যে বিপ্লবী জনগণের উপর নানা প্রকারের অত্যাচার করেছিল, সেটা কি মহান রুশ বিপ্লব ও মহান চীনা বিপ্লবের জন্য এই ধরনের ভূমিকা পালন করে নি?

"মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চীনা ভূখণ্ড তাইওয়ানে হামলা চালিয়েছিল এবং বিগত নয় বছর ধরে সে এই এলাকা দখল করে রেখেছে; আবার কিছু দিন আগে তারা সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে লেবানন আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বের বহু দেশে কয়েক শ' সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। চীনের ভূখণ্ড তাইওয়ানে, লেবাননে এবং বিদেশে সমস্ত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গলায় জড়ানো এক একটা ফাঁস। মার্কিনীরা নিজেরাই এই ফাঁস বানিয়েছে, আর কেউ নয় এবং তারা নিজেরাই তা নিজেদের গলায় জড়িয়েছে, আর ফাঁসির দড়ির অপর প্রান্ত তারা চীনা জনগণ, আরব দেশগুলোর জনগণ ও পৃথিবীর সমস্ত দেশের শান্তিপ্রিয়, আক্রমণবিরোধী জনগণের হাতে তুলে দিয়েছে। মার্কিন হামলাকারীরা যত বেশী সময় ধ'রে এই সব দেশে থাকবে তাদের গলার ফাঁস ততই শক্ত হবে।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

সাম্রাজ্যবাদীরা বেশী দিন টিকে থাকবে না, কারণ তারা সব সময়ই কুকর্ম করে। তারা সমস্ত দেশেই জনগণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের লালন-পালন করে থাকে; বহু উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ এবং সামরিক ঘাঁটি তারা বলপূর্বক দখল করেছে এবং আণবিক যুদ্ধের হুমকি দিয়ে শান্তিকে বিপন্ন করছে। ফলে, সমগ্র পৃথিবীর শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী লোক বাধ্য হয়েই তাদের বিরুদ্ধে এক সঙ্গে সংগ্রামে রুখে দাঁড়াচ্ছেন বা রুখে দাঁড়াবেন। তবু সাম্রাজ্যবাদীরা এখনো বেঁচে আছে এবং এখনো তারা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় যথেচ্ছা জুলুম চালাচ্ছে। পাশ্চাত্য জগতে তারা এখনো নিজ-নিজ দেশের জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এই রূপ অবস্থা অবশ্যই বদলে যাবে। সাম্রাজ্যবাদের, প্রধানতঃ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ ও অত্যাচারের অবসান ঘটানো সারা দুনিয়ার জনগণের কর্তব্য।

সিনহুয়া বার্তা সংস্থার সংবাদদাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সর্বত্রই যথেচ্ছা জুলুম চালিয়ে নিজেকে সারা দুনিয়ার জনগণের শত্রুতে পরিণত করেছে এবং ক্রমে ক্রমে আরো বেশী করে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। যাঁরা গোলাম হতে নারাজ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাতের আণবিক বোমা এবং উদজান বোমা কখনো তাঁদেরকে সন্ত্রস্ত করতে পারবে না। মার্কিন হামলাকারীর বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার জনগণের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ হচ্ছে অপ্রতি-রোধ্য। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম নিশ্চিতভাবে মহত্তর বিজয় লাভ করবে।

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পানামার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দেশপ্রেমমূলক সংগ্রামের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতি-গোষ্ঠী যদি তাদের আগ্রাসী নীতি ও যুদ্ধ নীতিকে চালিয়ে যাবার জন্য জেদ ধরে, তা'হলে সে দিন অবশ্যই আসবে যে

দিন সারা দুনিয়ার জনগণ তাদেরকে ফাঁসি দেবেন। অন্যান্য মার্কিন অনুচরদেরও ঠিক একই পরিণতি হবে।

সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সভায় প্রদত্ত ভাষণ
(৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় আমরা এই ধারণায় উপনীত হয়েছি যে, রণনীতির দিক থেকে সমস্ত শত্রুকে আমাদের তুচ্ছ করে দেখতে হবে কিন্তু রণকৌশলের দিক থেকে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে শত্রুদেরকে অবশ্যই আমাদের তুচ্ছ করে দেখতে হবে, কিন্তু এক একটা বিশেষ প্রশ্নে তাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। যদি আমরা সামগ্রিকভাবে শত্রুদেরকে তুচ্ছ করে না দেখি, তা'হলে আমরা সুবিধাবাদের ভুল করবো। মার্কস ও এঙ্গেলস যখন কেবল দু'জনমাত্র ছিলেন, তখনই তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটবেই। কিন্তু বিশেষ বিশেষ

প্রশ্নে, এক একটা শত্রুর মোকাবিলায়, যদি আমরা তাদেরকে গুরুত্ব না দেই, তা'হলে আমরা হঠকারিতার ভুল করবো। শুধু এক একটা খণ্ডযুদ্ধ করেই যুদ্ধ করা যেতে পারে এবং শত্রুবাহিনীর এক একটা অংশকে ধ্বংস করেই কেবল তাকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংস করা যেতে পারে। কারখানা শুধু এক একটা করে নির্মাণ করা যেতে পারে। কৃষক জমি চাষ করতে পারেন কেবলমাত্র খণ্ড খণ্ড করে। খাবার ব্যাপারেও তাই। রণনীতিগতভাবে আমরা খাদ্য-গ্রহণের ব্যাপারটা তুচ্ছ করে দেখি: আমরা জানি খাবার খেয়ে আমরা শেষ করতে পারি। কিন্তু আসলে খাবার সময় আমরা এক এক গ্রাস করে খাই। গোটা একটা ভোজের খাবারকে এক গ্রাসে গেলা সম্ভব নয়। এটাকে বলা হয় পৃথক পৃথক ক'রে সমাধান করা। সামরিক গ্রন্থে এটাকে বলা হয়, শত্রুবাহিনীকে একটা একটা করে ধ্বংস করা।

বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকদের পার্টির মস্কো সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (১৮ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

আমার মতে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা নতুন সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে। আজকের দুনিয়ায় দু'ধরনের বায়ু প্রবাহিত—পূর্ব ও পশ্চিম বায়ু। চীনে একটা প্রবাদ আছে—"হয় পূর্ব বায়ু পশ্চিম বায়ুকে দাবিয়ে রাখে, না হয় পশ্চিম বায়ু পূর্ব বায়ুকে দাবিয়ে রাখে।" আমার মতে বর্তমান পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, পূর্ব বায়ু পশ্চিম বায়ুকে দাবিয়ে রাখছে। এর অর্থ এই যে, সমাজতান্ত্রিক শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর অত্যন্ত বেশী প্রাধান্য লাভ করেছে।

ঐ

৭. সংগ্রাম করতে সাহসী হও, বিজয় অর্জন করতে সাহসী হও

সারা দুনিয়ার জনগণ ঐক্যবদ্ধ হোন, মার্কিন হামলাকারী ও তার সমস্ত পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করুন! সারা দুনিয়ার জনগণ নির্ভীক হোন, লড়াই করতে সাহসী হোন, বাধা-বিপত্তিতে নির্ভয় হোন, তরঙ্গমালার মতো এগিয়ে চলুন। তা'হলে সারা দুনিয়াটাই হবে জনগণের। সব রকমের দানব সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে।

"মার্কিন আক্রমণের বিরুদ্ধে কংগোর (লিওপোল্‌ডভিল) জনগণের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (২৮শে নভেম্বর, ১৯৬৪)

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক ও দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির সুস্পষ্ট মূল্যায়ন ক'রে একথা বুঝতে পেরেছে যে, সমস্ত আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ শুধু যে ব্যর্থ করতে হবে তা নয়—তা' করা সম্ভবও বটে। যখন আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছিল তখন আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে, এটা শুধু সাময়িক, আঁধার শীঘ্রই কেটে যাবে, একটু পরেই দেখা দেবে ঊষার আলো।

"বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য"
(২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

মানবজাতির ইতিহাসে দেখা যায় সমস্ত মরণোন্মুখ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিই অবশ্যই বিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বশেষ মরণ-কামড় দেয়; কোনো কোনো বিপ্লবী প্রায়ই তাদের ভেতরকার শক্তিহীনতা ধরতে না পেরে, তাদের বাহ্য শক্তির প্রকাশ দেখে কিছু সময়ের জন্য বিভ্রান্তিতে পড়েন এবং তাঁরা এই সারসত্যটা ধরতে পারেন না যে, শত্রুরা শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁরা নিজেরা শীঘ্রই জয়ী হবেন।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সন্ধিক্ষণ" (১২ই অক্টোবর, ১৯৪২)

যদি তারা (কুওমিনতাঙ) যুদ্ধ করে, আমরা তাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেব। বাস্তব ঘটনা এই যে, যদি তারা আক্রমণ করে, তবে আমরা তাদের ধ্বংস করে ফেলবো, তখনই তারা সন্তুষ্টি লাভ করবে। তাদের কিছুটা ধ্বংস করলে, তারা কিছুটা সন্তুষ্টি লাভ করবে; অধিক ধ্বংস করলে, অধিক সন্তুষ্টি লাভ করবে; পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করলে, পুরোপুরিভাবে সন্তুষ্টি লাভ করবে। চীনের সমস্যা জটিল, তাই আমাদের মস্তিষ্কও কিছুটা জটিল হওয়া প্রয়োজন। যদি তারা যুদ্ধ করতে আসে, আমরা যুদ্ধ করবো; আমরা যুদ্ধ করবো শান্তি অর্জনের জন্য।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে"
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

যদি কেউ আমাদের উপর আক্রমণ করে এবং পরিস্থিতি লড়াইয়ের অনুকূল হয়, তা'হলে আমাদের পার্টি অবশ্যই আত্মরক্ষার জন্য তাকে দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে, পুরোপুরি এবং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে (আমরা অবিবেচনার সঙ্গে আঘাত করি নে, কিন্তু যখন আঘাত করি তখন আমাদের অবশ্যই জয়ী হতে হবে)। আমরা কোনো মতেই প্রতিক্রিয়াশীলদের তর্জন-গর্জনে ভীত হবো না।

"কুওমিনতাঙের সঙ্গে শান্তি আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিজ্ঞপ্তি" (২৬শে আগষ্ট, ১৯৪৫)

আমাদের ইচ্ছার কথা বলতে গেলে, আমরা একদিনও যুদ্ধ করতে চাই নে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি আমাদের যুদ্ধ করতে বাধ্য করে, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারি।

"মার্কিন সাংবাদিকা আনা লুই স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ" (আগষ্ট, ১৯৪৬)

আমরা শান্তি চাই। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতক্ষণ নিজের উদ্ধত ও যুক্তিহীন দাবি এবং আক্রমণ সম্প্রসারণের ষড়যন্ত্র পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ চীনা জনগণের একমাত্র করণীয় হলো, কোরিয়ার জনগণের সাথে একযোগে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে দৃঢ়সংকল্প থাকা। এর কারণ এই নয় যে আমরা যুদ্ধপ্রিয়। আমরা বরং অবিলম্বে যুদ্ধ থামাতে ইচ্ছুক, অবশিষ্ট সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতে করা যাবে। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তা করতে চায় না। তবে তাই হোক, যুদ্ধ চলতে থাক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যত বছর পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে চায় আমরাও তত বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে প্রস্তুত। যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধ করে যাব, চীনা ও কোরিয়ার জনগণের চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব।

চীন গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম জাতীয় কমিটির চতুর্থ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩)

আমাদের নিজেদের ভেতর থেকে সমস্ত হীনবল চিন্তাধারা দূর করতে হবে। যে সমস্ত দৃষ্টিকোণ শত্রুর শক্তিকে বড় করে দেখে আর জনগণের শক্তিকে দেখে ছোট করে—তা সবই ভুল।

"বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য"
(২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতিসমূহ নিজেদের মুক্তির জন্য কোনোমতেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের "শুভবুদ্ধির" উপর ভরসা করে বসে থাকবেন না, কেবলমাত্র নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় ক'রে এবং অটলভাবে সংগ্রাম চালিয়েই তাঁরা বিজয় অর্জন করতে পারেন।

"মার্কিন-ন্গো দিন দিয়েম চক্রের দ্বারা দক্ষিণ ভিয়েতনামের উপর আক্রমণের ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনগণকে হত্যা করার বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিবৃতি" (২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৩)

দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ যখনই বেধে উঠুক না কেন, আমাদেরকে ভালভাবে প্রস্তুত থাকতেই হবে। যদি এটা সত্বরই ঘটে, ধরা যাক, আগামী কাল সকালেই ঘটে, তার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এটাই প্রথম বক্তব্য। বর্তমান আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে, গৃহযুদ্ধকে সাময়িকভাবে আংশিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব এবং গৃহযুদ্ধ সম্ভবতঃ সাময়িকভাবে কতগুলো স্থানীয় যুদ্ধের রূপ নেবে। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় বক্তব্য। প্রথম বক্তব্যের অবস্থার জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি, দ্বিতীয় বক্তব্যের অবস্থাটা বহু আগে থেকেই চলে আসছে। এক কথায়, আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রস্তুত থাকলে আমরা যথার্থভাবে সব রকমের জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবো।

"জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি"
(১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৫)

৮. গণযুদ্ধ

বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের যুদ্ধ, কেবলমাত্র জনসাধারণকে সমাবেশ করে এবং তাঁদের উপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

"জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন" (২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)

সত্যিকারের লৌহ প্রাকার কি? তা হচ্ছে জনসাধারণ, কোটি কোটি জনসাধারণ, যাঁরা বিপ্লবকে অকৃত্রিমভাবে ও আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃত লৌহ প্রাকার, এটার বিনাশসাধন করা যে কোনো শক্তির পক্ষেই অসম্ভব,

একেবারেই অসম্ভব। প্রতিবিপ্লবী শক্তি আমাদের বিনাশ করতে পারে না, আমরাই বরং তার বিনাশসাধন করবো। বিপ্লবী সরকারের চারপাশে কোটি কোটি জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং আমাদের বিপ্লবী যুদ্ধকে সম্প্রসারিত করে আমরা সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবো এবং সমগ্র চীন অধিকার করতে পারবো।

ঐ

যুদ্ধ করার শক্তির সমৃদ্ধতম উৎস নিহিত রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। জাপান যে আমাদের লাঞ্ছিত করতে সাহস পায়, তার প্রধান কারণ হলো চীনা জনসাধারণের অসংগঠিত অবস্থা। এই ত্রুটি দূর করলেই আগুনের আবেষ্টনীতে ঢুকে পড়া একটা উন্মত্ত ষাঁড়ের মতো জাপানী আক্রমণকারীরা আমাদের কোটি কোটি জাগ্রত জনগণের সম্মুখীন হবে, আমাদের কণ্ঠস্বরের নিছক আওয়াজই তার মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করবে এবং এই বুনো ষাঁড়টা অবশ্যই পুড়ে মরবে।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের এমনভাবে লাঞ্ছিত করছে যে, আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে তাদের মোকাবিলা করা প্রয়োজন। আমাদের কেবলমাত্র শক্তিশালী নিয়মিত সৈন্যবাহিনী থাকলেই চলবে না, উপরন্তু ব্যাপকভাবে গণ-মিলিশিয়া ডিভিসনও আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এমনি করলে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের দেশ আক্রমণ করার সময় এক ইঞ্চিও এগুতে পারবে না।

সিনহুয়া বার্তা সংস্থার সংবাদদাতার সঙ্গে
সাক্ষাৎকার (২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮)

বিপ্লবী যুদ্ধের সামগ্রিক বিচারে, জনগণের গেরিলা যুদ্ধ ও প্রধান শক্তি হিসেবে লাল ফৌজ একজন মানুষের ডান হাত আর বাঁ হাতের মতো। জনগণের গেরিলা যুদ্ধ বাদ দিয়ে যদি কেবলমাত্র প্রধান শক্তি হিসেবে লাল ফৌজই থাকতো, তা'হলে আমরা হয়ে পড়তাম এক বাহুবিশিষ্ট সেনাপতির মতো। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, বিশেষ করে যুদ্ধ করার জন্য, যখন আমরা ঘাঁটি এলাকার জনগণকে একটা উপাদান হিসেবে উল্লেখ করি, তখন আমরা বুঝাই যে সেই জনগণ সশস্ত্র। ঘাঁটি এলাকায় এগুতে শত্রুরা যে ভয় পায়, তার প্রধান কারণ হচ্ছে এটাই।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা"
(ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

যুদ্ধের জয়-পরাজয় প্রধানতঃ যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু, শুধুমাত্র এগুলোর দ্বারাই নয়; যুদ্ধরত উভয় পক্ষের যুদ্ধ পরিচালনা করার আত্মগত সামর্থ্যের দ্বারাও এটা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুগত অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত সীমা লংঘন করে কোন রণবিশারদ যুদ্ধে বিজয় অর্জনের আশা করতে পারেন না, তবে এই সীমার মধ্যেই তিনি বিজয় লাভের চেষ্টা করতে পারেন এবং এটা তাঁকে অবশ্যই করতে হবে। রণবিশারদের ক্রিয়ামঞ্চ গড়ে উঠে বাস্তবমুখী বস্তুগত অবস্থার

ভিত্তিতে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক প্রাণবান নাট্যানুষ্ঠান তিনি পরিচালনা করতে পারেন।

ঐ

যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে "নিজকে রক্ষা করা ও শত্রুকে ধ্বংস করা", এ ছাড়া আর কিছুই নয় (শত্রুকে ধ্বংস করার অর্থ শত্রুকে নিরস্ত্র করা, অর্থাৎ "শত্রুর প্রতিরোধ শক্তি বিনষ্ট করা", কিন্তু তার প্রতিটি লোককে দৈহিকভাবে ধ্বংস করা নয়)। প্রাচীন যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো বর্শা আর ঢাল: বর্শা আক্রমণ করার জন্য, শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য; আর ঢাল প্রতিরক্ষার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য। আজকের সব অস্ত্রও এই দু'য়েরই পরিবর্ধিত রূপ। বোমারু বিমান, মেশিনগান, দূর পাল্লার কামান এবং বিষাক্ত গ্যাস হচ্ছে বর্শার উন্নত রূপ; আর বিমান-আক্রমণবিরোধী আশ্রয়-স্থল, লৌহ শিরস্ত্রাণ, কংক্রিট নির্মিত দুর্গাদি ও গ্যাসনিরোধক মুখোস হ'চ্ছে ঢালের উন্নত রূপ। ট্যাংক হচ্ছে

এমন একটা নতুন অস্ত্র যার মধ্যে এ দু'য়ের সম্মিলন ঘটেছে। আক্রমণ হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায়, কিন্তু প্রতিরক্ষাকেও বাদ দেওয়া যায় না। আক্রমণের আশু লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা, কিন্তু সেই সঙ্গে তা নিজেকে রক্ষা করাও বটে, কারণ শত্রু ধ্বংস না হলে আপনি নিজেই ধ্বংস হবেন। প্রতিরক্ষার আশু লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, কিন্তু আবার একই সময়ে প্রতিরক্ষা হচ্ছে আক্রমণের সম্পূরক উপায় অথবা আক্রমণ-পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতির উপায়। পশ্চাদপসরণ হচ্ছে প্রতিরক্ষার অন্তর্ভুক্ত এবং প্রতিরক্ষার ধারাবাহিক রূপ; আর পশ্চাদ্ধাবন হচ্ছে আক্রমণের ধারাবাহিক রূপ। এ কথা উল্লেখ করা দরকার যে, যুদ্ধের মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে ধ্বংস করা আর গৌণ লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা, কারণ কেবলমাত্র শত্রুকে বিপুল সংখ্যায় ধ্বংস করেই নিজেকে কার্যকরীভাবে রক্ষা করা যায়। কাজেই, শত্রুকে ধ্বংস করার প্রধান উপায় হিসেবে আক্রমণই হচ্ছে মুখ্য, আর শত্রুকে ধ্বংস করার সম্পূরক উপায় হিসেবে

এবং নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় হিসেবে প্রতিরক্ষা হচ্ছে গৌণ। বাস্তব যুদ্ধে প্রতিরক্ষা যদিও অনেক সময়ে প্রধান, তৎসত্ত্বেও বাকী সময়ে আক্রমণই প্রধান; তবু যুদ্ধকে সামগ্রিকভাবে ধরলে আক্রমণটাই হচ্ছে প্রধান।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

সমস্ত সামরিক কার্যকলাপের পরিচালক-নীতিই এসেছে একটি মৌলিক নীতি থেকে; তা'হল নিজের শক্তির সংরক্ষণের জন্য এবং শত্রুর শক্তির ধ্বংস সাধনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করা।...... যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ আত্মবলিদানে উৎসাহ দেওয়াটা ন্যায্য এমন কথা তাহ'লে কেমন করে বলা যায়? প্রত্যেকটি যুদ্ধেরই মূল্য দিতে হয়, কখনো কখনো অত্যন্ত বেশী মূল্য দিতে হয়। "নিজকে রক্ষা করা" ও এই অবস্থার মধ্যে কি দ্বন্দ্ব নেই? বস্তুতঃ আদৌ কোনো দ্বন্দ্ব নেই; আরো সঠিকভাবে বলা যায় যে, এ দু'টি হচ্ছে পরস্পরের বিপরীত ও পরিপূরক।

কারণ এ ধরনের বলিদান কেবলমাত্র শত্রুকে ধ্বংস করার জন্যই যে প্রয়োজন তা নয় বরং নিজেকে রক্ষা করার জন্যও তার দরকার — সামগ্রিক ও স্থায়ী সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আংশিক ও সাময়িক "অ-সংরক্ষণ" (বলিদান বা মূল্যদান)। এই মৌলিক নীতি থেকে উদ্ভূত হয় সমগ্র সামরিক কার্যকলাপের পরিচালক-নীতিগুলো—গুলি ছোড়ার নীতি (নিজেকে রক্ষা করার জন্য আড়ালে থাকা এবং শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগের সমগ্র ক্ষমতা কাজে লাগান) থেকে শুরু করে রণনীতিগত নীতি পর্যন্ত সবই এই মৌলিক নীতির ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমস্ত প্রযুক্তিগত, রণ-কৌশলগত, যুদ্ধাভিযানগত ও রণনীতিগত নীতিতে এই মৌলিক নীতিরই প্রয়োগ দেখা যায়। নিজেকে রক্ষা করার ও শত্রুকে ধ্বংস করার নীতি হচ্ছে সমস্ত সামরিক নীতির ভিত্তি।

"জাপ-বিরোধী গেরিলাযুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" (মে, ১৯৩৮)

আমাদের সামরিক নীতি হচ্ছে:

(১) প্রথমে শত্রুর ছড়ানো ও বিচ্ছিন্ন শক্তিকে আঘাত করা, তার পরে তার কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী অংশকে আঘাত করা।

(২) প্রথমে ছোট ও মাঝারি আকারের শহর এবং বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলগুলো দখল করা, তার পরে বড় শহরগুলো দখল করা।

(৩) শত্রুর কার্যকরী শক্তিকে ধ্বংস করাটাই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য, শহর ও জায়গা রক্ষা করা বা দখল করাটা প্রধান লক্ষ্য নয়। কোন শহর বা জায়গা রক্ষা করা বা দখল করা হচ্ছে শত্রুর কার্যকরী শক্তি ধ্বংস করার ফল; অনেক সময়ে, শুধুমাত্র বহুবার হাত বদলের পরেই কোন শহর বা জায়গা শেষবারের মতো রক্ষা করা ও দখলে রাখা সম্ভব।

(৪) প্রত্যেকটি লড়াইয়ে নিজের চরম উৎকৃষ্ট শক্তি কেন্দ্রীভূত করা (শত্রুর শক্তির দুই, তিন, চার এমন কি কখনো কখনো পাঁচ বা ছয় গুণ বেশী), শত্রুকে চারদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে ঘেরাও করা, তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা

চালানো এবং বেড়াজাল থেকে কাউকে পালিয়ে যেতে না দেওয়া। বিশেষ অবস্থায় শত্রুর উপর মারাত্মক আঘাত হানার পদ্ধতি গ্রহণ করা, অর্থাৎ সকল শক্তি জড় করে শত্রুর সম্মুখ ফ্রণ্টে ও এক পার্শ্বে বা উভয় পার্শ্বে আঘাত হানা; তার উদ্দেশ্য হবে, শত্রুর একটা অংশকে ধ্বংস করা ও অপর একটা অংশকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া, যাতে আমাদের সেনাবাহিনী নিজেদের সেনাদলকে শত্রুবাহিনীর অন্যান্য অংশকে ধ্বংস করার জন্য তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত করতে পারে। যে সব লড়াইয়ে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসান বেশী অথবা লাভ লোকসান সমান হবে, তেমন শক্তিক্ষয়ী লড়াই এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করা। এমনি করে সমগ্রভাবে আমরা নিকৃষ্ট (সংখ্যার দিক থেকে) হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি অংশে এবং প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট যুদ্ধাভিযানে আমরা চরমভাবে উৎকৃষ্ট হতে পারবো এবং এটাই যুদ্ধাভিযানে আমাদের জয়কে নিশ্চিত করে। সময় যত এগুবে আমরা ততই সমগ্রভাবে উৎকৃষ্ট হয়ে উঠবো এবং অবশেষে সমস্ত শত্রুকে নিশ্চিহ্ন

করবো।

(৫) তৈরী না হয়ে কোনো লড়াই না করা, জয় লাভ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোনো লড়াই না করা, প্রত্যেকটি লড়াইয়ের জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার চেষ্টা করা এবং আমাদের আর শত্রুর মধ্যকার অবস্থাকে তুলনা-মূলকভাবে বিচার করে আমাদের বিজয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৬) সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করা, আত্মবলিদানে ভয় না করা, ক্লান্তির ভয় না করা ও ক্রমাগত লড়াই করার (অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম বিশ্রাম না নিয়েই একটানা কয়েকটা লড়াই চালিয়ে যাবার) যুদ্ধরীতি পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত করা।

(৭) শত্রু যখন চলন্ত অবস্থায় তখন তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করা। একই সময়ে অবস্থানগত আক্রমণের রণকৌশলের দিকে মনোযোগ দেওয়া, শত্রুর সুরক্ষিত ঘাঁটি ও শহরগুলোকে দখল করা।

(৮) শহরগুলো আক্রমণ করা সম্পর্কে বক্তব্য হলো, শত্রুর যে সমস্ত ঘাঁটি ও শহরে রক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল, দৃঢ়-সংকল্পের সাথে তা দখল করা। শত্রুর যে সমস্ত ঘাঁটি ও শহরের রক্ষা-ব্যবস্থা মাঝারি ধরনের, অবস্থা অনুকূল থাকলে সুযোগ বুঝে তা' দখল করে নেওয়া। কিন্তু শত্রুর সমস্ত দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত ঘাঁটি ও শহরের বেলায়, যতদিন না অবস্থা পেকে উঠছে ততদিন অপেক্ষা করা এবং পরে তা দখল করা।

(৯) শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র আর অধিকাংশ বন্দীসৈন্য দিয়ে আমাদের শক্তিকে পূরণ করে নেওয়া। আমাদের ফৌজের জনশক্তি ও সাজ-সরঞ্জামের প্রধান উৎস হচ্ছে যুদ্ধ ফ্রণ্ট।

(১০) দু'টি যুদ্ধাভিযানের মাঝখানে যে সময় পাওয়া যাবে, সেই সময়কে বাহিনীর বিশ্রাম এবং প্রশিক্ষণ ও সুসম্বদ্ধকরণের জন্য নিপুণভাবে ব্যবহার করা। বিশ্রাম এবং প্রশিক্ষণ ও সুসম্বদ্ধকরণের জন্য সাধারণভাবে খুব বেশী সময় দেওয়া উচিত নয়; যতদূর সম্ভব, শত্রুদের শ্বাস নেবার সময় পর্যন্ত দেওয়া উচিত নয়।

চিয়াং কাই-শেককে পরাজিত করতে গণমুক্তি

ফৌজ এই প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করেছে। আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী শত্রুদের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের যুদ্ধের ভেতর দিয়ে পোড় খেয়ে গণ-মুক্তি ফৌজ এই সব পদ্ধতি গড়ে তুলেছে; আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সব পদ্ধতি সম্পূর্ণ উপযোগী। ...... আমাদের রণনীতি ও রণকৌ-শল গড়ে উঠেছে গণযুদ্ধের ভিত্তিতে; দুনিয়ার কোনো গণবিরোধী সৈন্যবাহিনীর পক্ষেই আমাদের এই রণনীতি ও রণকৌশলকে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

"বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য"
(২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

প্রস্তুতি না থাকলে উৎকৃষ্ট অবস্থা প্রকৃত উৎকৃষ্ট অবস্থা নয় এবং এতে কোনো উদ্যোগও থাকতে পারে না। এই বিষয়টা অনুধাবন করতে পারলে, নিকৃষ্ট অথচ প্রস্তুত সৈন্যবাহিনী প্রায়ই অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা উৎকৃষ্ট শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

৯. গণফৌজ

গণ-ফৌজ না থাকলে জনগণের কিছুই থাকবে না।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

এই ফৌজ শক্তিশালী, কারণ এর সব সদস্যেরই একটা সচেতন শৃংখলা আছে: তাঁরা অল্পসংখ্যক লোকের বা কোনো একটা সংকীর্ণ চক্রের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, ব্যাপক জনসাধারণের এবং সমগ্র জাতির স্বার্থে একত্রিত হয়েছেন এবং লড়াই করছেন। চীনা জনগণের সাথে একত্রে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো এবং মনেপ্রাণে তাঁদের সেবা করাই হচ্ছে এই ফৌজের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ঐ

চীনা লাল ফৌজ হচ্ছে বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য পালন করবার একটা সশস্ত্র দল। বিশেষ করে বর্তমানে এটা কিছুতেই হতে পারে না যে লাল ফৌজ কেবলমাত্র যুদ্ধই করবে; শত্রুর সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য লড়াই করা ছাড়াও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, জনসাধারণকে সংগঠিত করা, তাঁদেরকে সশস্ত্র করা, বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ও পার্টি-সংগঠন স্থাপনের কাজে তাঁদের সাহায্য করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যকেও একে কাঁধে তুলে নিতে হবে। নিছক লড়াই করার জন্যই লাল ফৌজ লড়াই করে না, সে লড়াই করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানোর জন্য, জনসাধারণকে সংগঠিত করার জন্য, তাঁদেরকে সশস্ত্র করার জন্য এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁদেরকে সাহায্য করার জন্য; এই সব উদ্দেশ্য ছাড়া লড়াই হয়ে উঠে অর্থহীন, আর লাল ফৌজের টিকে থাকারও কোনো অর্থ থাকে না।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

গণ-মুক্তি ফৌজ সর্বদাই একটা সংগ্রামী বাহিনী। এমন কি দেশব্যাপী জয় লাভের পরেও, যে সময় পর্যন্ত দেশের ভেতরে শ্রেণী বিলুপ্ত হবে না এবং দুনিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাও থেকে যাবে সেই ঐতিহাসিক সময় ধরে আমাদের ফৌজ সংগ্রামী বাহিনীই থেকে যাবে। এই বিষয়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝি বা দ্বিধা থাকতে পারে না।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

আমাদের যুদ্ধ করার জন্য একটা ফৌজ এবং পরিশ্রম করার জন্যও একটা ফৌজ আছে। যুদ্ধ করার ফৌজ হিসেবে আমাদের আছে অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী; তারাও দুই ধরনের কাজ করে—যুদ্ধ এবং উৎপাদন। কারণ আমাদের দু'টি ফৌজ আছে—যুদ্ধ করার ফৌজ ও পরিশ্রম করার ফৌজ, এ ছাড়া আমাদের যুদ্ধ করার ফৌজ এই দুই ধরনের কাজ করতে সক্ষম এবং জনসাধার-

ণের মধ্যে কাজ করতে সুনিপুণ, তাই আমরা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করতে পারি এবং জাপানী সাম্রাজ্য-বাদকে পরাজিত করতে পারি।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

আমাদের দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে সুসম্বদ্ধ করা হবে, কোনো সাম্রাজ্যবাদীকেই আমাদের দেশের ভূখণ্ডে পুনর্বার আক্রমণ করতে দেওয়া হবে না। নির্ভীক ও সুপরীক্ষিত গণ-মুক্তি ফৌজকে ভিত্তি ক'রে, আমাদের জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে সংরক্ষণ করা ও প্রসারিত করা অবশ্যই প্রয়োজন। আমাদের কেবলমাত্র একটি শক্তিশালী স্থল-বাহিনীই থাকবে না, উপরন্তু একটি শক্তিশালী বিমান-বাহিনী এবং একটি শক্তিশালী নৌ-বাহিনীও থাকবে।

চীন গণ রাজনৈতিক পরামর্শ পরিষদের প্রথম পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ (২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯)

আমাদের নীতি হচ্ছে—পার্টি বন্দুককে পরিচালনা করে, বন্দুককে কোনো মতেই পার্টিকে পরিচালনা করতে দেওয়া হবে না।

"যুদ্ধ ও রণনীতির সমস্যা" (৬ই নভেম্বর, ১৯৩৮)

আমাদের সমগ্র ফৌজের কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের অবশ্যই সব সময় মনে রাখতে হবে যে, আমরা হচ্ছি মহান গণ-মুক্তি ফৌজ, আমরা মহান চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বাহিনী। পার্টির নির্দেশ নিয়ত মেনে চললে আমরা অবশ্যই জয়ী হবো।

"চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের ইস্তাহার" (অক্টোবর, ১৯৪৭)

১০. পার্টি-কমিটির নেতৃত্ব

পার্টি-কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বকে সুনিশ্চিত করার জন্য এবং কার্য পরিচালনা কোনো ব্যক্তি-বিশেষের একচেটিয়া হয়ে পড়া রোধ করবার জন্য পার্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিধান। সম্প্রতি দেখা গেছে যে, কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় সংস্থায় (অবশ্য সমস্ত সংস্থায় নয়) কার্য পরিচালনাকে ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা একচেটিয়া করে নেওয়া এবং ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করাটা স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান পার্টি-কমিটির সভায় স্থির করা হয় না বরং ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা স্থির করা হয়, পার্টি-কমিটির সদস্যপদ নামমাত্র হয়ে পড়েছে।

কমিটির সদস্যদের মধ্যকার মতানৈক্য মীমাংসা করা যায় না এবং দীর্ঘকাল ধরে তা অমীমাংসিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। পার্টি-কমিটির সদস্যরা নিজদের মধ্যে কেবলমাত্র বাহ্য ঐক্য বজায় রাখেন, প্রকৃত ঐক্য নয়। এই অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। এখন থেকে সমস্ত নেতৃস্থানীয় সংস্থায়—কেন্দ্রীয় কমিটির আঞ্চলিক ব্যুরো থেকে বিভাগীয় পার্টি-কমিটি পর্যন্ত, ফ্রণ্ট কমিটি থেকে ব্রিগেড কমিটি ও সামরিক এলাকার পার্টি-কমিটি (বিপ্লবী সামরিক কমিটির শাখা অথবা নেতৃস্থানীয় গ্রুপ) পর্যন্ত, সরকারী সংস্থা, গণ-সংগঠন, সংবাদ প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদপত্র অফিসের পার্টির নেতৃস্থানীয় সভ্যদের গ্রুপে পার্টি-কমিটির সভার উন্নত ব্যবস্থা অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা (অবশ্য গুরুত্বহীন নগণ্য সমস্যা অথবা সেই সব সমস্যা যার সমাধান সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয়েছে এবং যা কার্যকরী করা শুধু বাকী আছে সে সব সমস্যা নয়) অবশ্যই কমিটির নিকট আলোচনার জন্য পেশ করতে হবে, কমিটির

উপস্থিত সদস্যদের উচিত তাঁদের মতামত সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা এবং একটি স্পষ্ট ও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, এবং তারপর সংশ্লিষ্ট সভ্যগণ সেটাকে কার্যকরী করবেন। ...... পার্টি-কমিটির সভাগুলো অবশ্যই দু'ভাগে ভাগ করতে হবে—স্থায়ী কমিটির অধিবেশন এবং পূর্ণাংগ অধিবেশন; দু'টিকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। অধিকন্তু, যৌথ নেতৃত্ব ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব এ দু'টির একটার প্রতি অতিরিক্ত জোর দিয়ে অপরটাকে যাতে উপেক্ষা করা না হয় সে দিকে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। সৈন্যবাহিনীতে, যুদ্ধের সময় এবং অবস্থার প্রয়োজনে, পরিচালকদের জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার আছে।

"পার্টি-কমিটি ব্যবস্থাকে উন্নত করা সম্পর্কে" (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮)

পার্টি-কমিটির সম্পাদকের একজন "স্কোয়াড নেতা" হবার ব্যাপারে নিপুণ হতে হবে। একটা পার্টি-কমিটিতে দশ থেকে বিশজন সদস্য থাকেন, এটা সৈন্যবাহিনীর একটা স্কোয়াডের মতো এবং সম্পাদক একজন "স্কোয়াড নেতা"-র মতো। বাস্তবিকই এই স্কোয়াডকে উত্তমরূপে পরিচালনা করা সহজ নয়। প্রতিটি কেন্দ্রীয় কমিটির আঞ্চলিক ব্যুরো এবং উপ-আঞ্চলিক ব্যুরো এখন এক একটা বিরাট এলাকার নেতৃত্ব করছে এবং অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব বহন করছে। নেতৃত্ব দেওয়া মানে শুধু সাধারণ ও নির্দিষ্ট কর্মনীতি স্থির করাই নয়, বরং সঠিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করাও। নির্ভুল সাধারণ ও নির্দিষ্ট কর্মনীতি থাকা সত্ত্বেও যদি কর্মপদ্ধতিকে অবহেলা করা হয়, তা'হলেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। পার্টি-কমিটিকে নিজের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে হলে অবশ্যই "স্কোয়াড সদস্যদের" উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাঁরা যাতে নিজেদের ভূমিকা পুরোপুরিভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য তাঁদেরকে সমর্থ করে তুলতে হবে। ভাল "স্কোয়াড নেতা" হবার জন্য সম্পাদককে অবশ্যই গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হবে ও পুংখানুপুংখরূপে তদন্ত চালাতে হবে। যদি সম্পাদক বা সহ-সম্পাদক

নিজেদের ‘‘স্কোয়াড সদস্যদের’’ মধ্যে প্রচার কার্যে ও সাংগঠনিক কার্যে মনোযোগ না দেন, যদি কমিটির সদস্যদের ও নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক ভালভাবে পরিচালিত করতে নিপুণ না হন, অথবা কি করে সভা ভালভাবে চালাতে হয় তা নিয়ে যদি গবেষণা না করেন, তা'হলে তাঁরা এই ‘‘স্কোয়াড সদস্যদের’’ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে অসুবিধায় পড়বেন। ‘‘স্কোয়াড সদস্যরা’’ যদি পায়ে পা মিলিয়ে অগ্রসর না হন, তা'হলে তাঁরা যুদ্ধ ও গঠন কার্যে রত কোটি কোটি মানুষকে নেতৃত্ব দেবার আশা কোনো দিনই করতে পারেন না। অবশ্য সম্পাদক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক এমনি যে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরুদের মেনে চলবে, সুতরাং স্কোয়াড নেতা ও তাঁর সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে এটা ভিন্ন ধরনের। এখানে আমরা শুধু একটা উপমা তুলে ধরেছি।

‘‘পার্টি-কমিটির কর্মপদ্ধতি’’ (১৩ই মার্চ, ১৯৪৯)

সমস্যা সামনে তুলে ধর। এটা যে শুধু ‘‘স্কোয়াড নেতা’’-কেই করতে হবে, তা নয়, কমিটির সদস্যদেরও করতে হবে। লোকের পিছনে টিপ্পনী কাটবেন না। সমস্যা দেখা দিলে সভা ডাকুন, সমস্যা সামনে তুলে ধরে আলোচনা করুন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, তা'হলেই সমস্যার সমাধান হবে। যদি সমস্যা থাকে এবং তা যদি সামনে তুলে ধরা না হয়, তা'হলে দীর্ঘদিন ধরে তা অমীমাংসিত থেকে যাবে, এমন কি কয়েক বছর ধরে তা চাপা থাকবে। ‘‘স্কোয়াড নেতা’’ ও কমিটির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা থাকা উচিত। সম্পাদক ও কমিটির সদস্যদের মধ্যকার, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি আঞ্চলিক ব্যুরোর মধ্যকার এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিটি আঞ্চলিক ব্যুরো ও এরিয়া পার্টি-কমিটির মধ্যকার পারস্পরিক সমঝোতা, সমর্থন ও বন্ধুত্বের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কিছুই নেই।

ঐ

“তথ্য বিনিময় কর”। এর অর্থ হচ্ছে, পার্টি-কমিটির সদস্যদের যে সব তথ্য জানা আছে, সে সম্পর্কে পরস্পরকে জানানো এবং নিজেদের মধ্যে মতামতের আদান-প্রদান করা উচিত। অভিন্ন ভাষা গড়ে ওঠার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো লোক এমনটা করে না, বরং লাও জি'র বর্ণিত লোকের মতো “যদিও তাদের মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ পরস্পরের কানে যায়, তবুও তাদের মধ্যে সারাজীবন আসা যাওয়া নেই”। ফলে, তাদের মধ্যে অভিন্ন ভাষা গ'ড়ে ওঠে না।

ঐ

আপনি যা বুঝেন না বা জানেন না, তা আপনার অধস্তনদের জিজ্ঞাসা করুন; তার প্রতি আপনার সম্মতি বা অসম্মতি লঘুভাবে ব্যক্ত করবেন না। ...... আমরা যা জানি না, তা' জানার ভান করা কখনো উচিত নয়, “অধস্তনলোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করা উচিত নয়” এবং নিচের

স্তরের কেডারদের মতামত আমাদের যত্ন সহকারে শোনা উচিত। শিক্ষক হবার আগে আপনি প্রথমে ছাত্র হোন; আদেশ জারী করার পূর্বে নিচের স্তরের কেডারদের কাছ থেকে শিখুন। ...... নিচের স্তরের কেডাররা যা বলেন তা নির্ভুল হতে পারে নাও হতে পারে, শোনার পর এটা বিশ্লেষণ করা উচিত। নির্ভুল অভিমতকে আমাদের অবশ্যই শুনতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হবে। ...... নিচের স্তর থেকে আসা ভুল মতামতকেও আমাদের শুনতে হবে, একেবারেই না শোনাটা ভুল; কিন্তু এ ধরনের মতামত শোনার পর সেই অনুসারে কাজ করা চলবে না, তার সমালোচনা করতে হবে।

ঐ

“পিয়ানো বাজাতে” শিখুন। পিয়ানো বাজাতে দশটা আঙ্গুলই চালনা করতে হয়, কয়েকটা আঙ্গুল চালনা করে আর অন্যগুলো না করে, এ কাজ করা যায় না। আবার দশটা আঙ্গুল দিয়ে এক সঙ্গে চাপ দিলেও মিষ্টি সুরের সৃষ্টি হয় না। উত্তম সুর সৃষ্টির

জন্য দশটা আঙ্গুলকে ছন্দানুসারে এবং পারস্পরিক সমন্বয় সহকারে চালাতে হবে। পার্টি-কমিটির উচিত এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখা এবং একই সময়ে কেন্দ্রীয় দায়িত্বের চারদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রের কাজও তার করা উচিত। বর্তমানে, আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কাজ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকা, সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট ও বিভিন্ন বিভাগসমূহের কর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং অন্য সকলকে বাদ দিয়ে শুধু কয়েকটি সমস্যার উপর সমগ্র মনোযোগ দিলে চলবে না। যেখানেই কোন সমস্যা দেখা দেয়, সেখানেই আমাদেরকে তার উপর অঙ্গুলি স্থাপন করতে হবে এবং এই পদ্ধতিকে আমাদের অবশ্যই ভালভাবে শিখে নিতে হবে। পিয়ানো কেউ ভালভাবে বাজান, কেউ বা খারাপভাবে বাজান; এই দুই ধরনের ব্যক্তি যে সুরের সৃষ্টি করেন তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। পার্টি-কমিটির কমরেডদেরকে অবশ্যই ভালভাবে ''পিয়ানো বাজাতে'' শিখতে হবে।

ঐ

''দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর''। এর অর্থ হলো, পার্টি-কমিটি এর প্রধান কাজকে শুধু ''ধরবে'' না, অবশ্যই ''দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে''। কোনো জিনিসকে শুধুমাত্র দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেই এবং লেশমাত্রও শিথিল না করেই তাকে ধারণ করা যায়। দৃঢ়ভাবে না ধরার অর্থ হচ্ছে মোটেই না ধরা। স্বভাবতঃই খোলা হাতে শক্ত করে কিছু ধরা যায় না। কোন কিছু ধরা হচ্ছে এমন করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা হলেও সেই মুষ্টি যদি দৃঢ় না হয় তা' হলে সেই ধরাও তখনো দৃঢ় হয় নি। আমাদের কোনো কোনো কমরেডও প্রধান কাজকে তেমন করে ধরেন, কিন্তু দৃঢ়ভাবে ধরেন না, তাই কাজেও তাঁরা ভাল করতে পারেন না। মোটেই না ধরলে চলবে না আবার ধরা দৃঢ় না হলেও চলবে না।

ঐ

''হিসাব কষতে সমর্থ হও''। এর অর্থ হলো পরিস্থিতি বা সমস্যার পরিমাণগত দিকে আমাদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে এবং মৌলিক পরি-

মাণগত বিশ্লেষণ করতে হবে। যে কোনো গুণই একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নিজেকে প্রকাশ করে, পরিমাণ ছাড়া গুণ হতেই পারে না। আমাদের বহু কমরেড আজও পর্যন্ত বোঝেন না যে, বস্তুর পরিমাণগত দিকে তাঁদের মনোযোগ দিতে হবে— মৌলিক পরিসংখ্যান, প্রধান শতকরা অনুপাত এবং বস্তুর গুণ নির্ধারণকারী পরিমাণগত সীমা, এই সব দিকে তাঁদের অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। তাঁদের মাথায় কোনো ''হিসেব'' নেই, ফলে তাঁরা ভুল না করেই পারেন না।

ঐ

''জনসাধারণকে আশ্বাসদানের বিজ্ঞপ্তি প্রচার কর''। সভার বিজ্ঞপ্তি আগেই দিতে হবে, এটা জনসাধারণকে আশ্বাসদানের বিজ্ঞপ্তি দেবার মতো, যাতে প্রত্যেকেই জানতে পারেন কি সমস্যার উপর আলোচনা হতে যাচ্ছে, কোন সমস্যার সমাধান করা হবে, এবং তাঁরা আগে থেকেই যাতে প্রস্তুতি নিতে পারেন। কোনো কোনো স্থানে প্রথমে রিপোর্ট

ও খসড়া-প্রস্তাবাদি তৈরী না করেই কেডারদের সভা ডাকা হয়, এবং সভার লোকজন উপস্থিত হলেই কেবল কাজ চালানো গোছের, উপস্থিত-মতো প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ যেন ''সৈন্য ও ঘোড়া এসে গেছে, কিন্তু খাদ্য ও তৃণাদি প্রস্তুত নেই''— এই রকম; এটা ভাল নয়। যদি প্রস্তুতি সারা না হয়ে থাকে, তা'হলে তাড়াহুড়া করে সভা ডাকবেন না।

ঐ

''সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প ও উন্নততর সৈন্য, এবং সহজতর প্রশাসন ব্যবস্থা''। কথাবার্তা, বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও প্রস্তাব সবই সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া উচিত। সভাও খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়।

ঐ

যে সব কমরেড আপনাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে মনোযোগ দিন। স্থানীয় সংগঠনেই

হোক বা সৈন্যবাহিনীতে হোক, উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা মনে রাখা উচিত। এ কথা পার্টি-বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খাটে। আমরা দেশের প্রতিটি স্থান থেকে এসে এখানে সমবেত হয়েছি এবং যে সব কমরেড আমাদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন শুধু তাঁদের সঙ্গেই নয়, বরং যাঁরা আমাদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁদের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে নিপুণ হওয়া উচিত।

ঐ

অহঙ্কার যথাসাধ্য পরিহার কর। যেকোনো নেতৃস্থানীয় লোকের পক্ষে এটা হচ্ছে নীতিগত বিষয় এবং ঐক্য বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ শর্তও বটে। গুরুতর ভুল যাঁরা করেন নি, বরং নিজেদের কাজে যাঁরা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন, তাঁদেরও অহঙ্কার করা উচিত নয়।

ঐ

দু'টি পার্থক্যরেখা স্পষ্ট করে টান। প্রথমতঃ, বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যে, ইয়েনান ও সীআনের মধ্যে। কেউ কেউ বুঝেন না যে, এই পার্থক্যরেখা তাঁদের টানতেই হবে। যেমন ধরুন, যখন তাঁরা আমলাতন্ত্রবাদের বিরোধিতা করেন তখন ইয়েনান সম্বন্ধে এমনভাবে বলেন যেন সেখানে "কিছুই ঠিক নয়"; তাঁরা ইয়েনানের আমলাতন্ত্রবাদ ও সীআনের আমলাতন্ত্রবাদের মধ্যে তুলনা ও পার্থক্য করেন না। এটা মূলতঃ ভুল। দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবী বাহিনীর অভ্যন্তরে ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে, সাফল্য ও ত্রুটির মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে হবে এবং এ দু'য়ের মধ্যে কোনটা মুখ্য ও কোনটা গৌণ তা স্পষ্ট করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, সাফল্যের পরিমাণ শতকরা ৩০ ভাগ না শতকরা ৭০ ভাগ? কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে বললে চলবে না। ব্যক্তি-বিশেষের কাজের মৌলিক মূল্যায়ন আমাদের অবশ্যই করতে হবে, তার সাফল্য শতকরা ৩০ ভাগ এবং ভুল শতকরা ৭০ ভাগ, না সাফল্য ৭০ ভাগ এবং ভুল ৩০ ভাগ? যদি তার সাফল্যের পরিমাণ সমগ্রের শতকরা ৭০

ভাগ হয় তা'হলে তার কাজকে মূলতঃ অনুমোদন করতে হবে। যে কাজে সাফল্যই প্রধান সে কাজে ভুলই প্রধান বলে বিবৃত করা একেবারেই ভুল। সমস্যার বিচারে এই দুইটি পার্থক্যরেখা টানতে আমাদের কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয় : বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবের মধ্যকার পার্থক্যরেখা এবং সাফল্য ও ত্রুটির মধ্যকার পার্থক্যরেখা। যদি এই দু'টি পার্থক্যরেখাকে আমরা মনে রাখি, তা'হলে আমরা ভালভাবে কাজ করতে পারবো; অন্যথায়, আমরা সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে তালগোল পাকিয়ে ফেলবো। স্বভাবতঃই, যদি এই পার্থক্যরেখা ভালভাবে টানতে হয়, তবে মনোযোগের সঙ্গে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিটি বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত বিশ্লেষণমূলক ও গবেষণামূলক।

ঐ

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীভূত পরিচালনায় গণতন্ত্র সুনিশ্চিত কর। কাজটা এই রকম ক'রে করতে হবে :

(১) পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার নির্ভুল পরিচালনার লাইন থাকতে হবে এবং সমস্যা দেখা দিলেই তা সমাধানের উপায় বের করতে হবে, যাতে করে তারা নিজেদেরকে নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

(২) উচ্চতর সংস্থাকে নিম্নতর সংস্থার অবস্থা ও জনসাধারণের জীবনের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকতে হবে, যাতে করে সঠিক পরিচালনার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে।

(৩) পার্টির কোন স্তরের সংস্থারই বিবেচনাহীনভাবে সমস্যার সমাধান করা উচিত নয়। একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে গেলে, অবশ্যই তা দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করতে হবে।

(৪) উচ্চতর সংস্থার যে সব সিদ্ধান্ত কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোকে অবশ্যই নিম্নতর সংস্থায় এবং পার্টি-সদস্যসাধারণের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে হবে। ......

(৫) পার্টির নিম্নতর সংস্থাগুলোকে ও পার্টি-সদস্যসাধারণকে উচ্চতর সংস্থার নির্দেশাদির

পুংখানুপুংখরূপে আলোচনা করতে হবে, যাতে করে এর তাৎপর্য তাঁরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারেন এবং তা কার্যকরী করার পদ্ধতি স্থির করতে পারেন।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

১১. গণ লাইন

জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহাস সৃষ্টির চালকশক্তি।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

জনসাধারণই হচ্ছেন প্রকৃত বীর, আর আমরা নিজেরা প্রায়ই হই শিশুর মতো ও অজ্ঞ; এটা না বুঝলে একেবারে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করাও অসম্ভব।

"'পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের' ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি" (মার্চ, এপ্রিল, ১৯৪১)

জনসাধারণের আছে সীমাহীন সৃজনী শক্তি। তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন, যেখানে

নিজেদের শক্তির পরিপূর্ণ স্ফুরণ সম্ভব সে সব স্থানে ও বিভাগে তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন, উৎপাদনের গভীরে ও ব্যাপ্তিতে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেন এবং নিজেদের কল্যাণের জন্য দিন দিন অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি করতে পারেন।

"অতিরিক্ত শ্রমশক্তি মুক্তির একটা পথ খুঁজে পেলো"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের উত্থান একটা অত্যন্ত বিরাট ঘটনা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ-গুলোতে কোটি কোটি কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। কোনো শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। যে সব বেড়াজাল তাঁদের বেঁধে রাখে, সে সব কিছুকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে তাঁরা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবেন। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোককে

তাঁরা ঝেঁটিয়ে কবরে পুঁতে ফেলবেন। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাঁদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে—তাঁরাই স্থির করবেন কাকে গ্রহণ করা হবে আর কাকে বর্জন করা হবে। তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাঁদের নেতৃত্ব দান করা? না তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কেটে তাঁদের সমালোচনা করা? অথবা তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিরোধিতা করা? এ তিনটার একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি চীনা লোকেরই আছে। তবে ঘটনাপ্রবাহ বেছে নেওয়ার কাজটা শীঘ্রই করে ফেলতে আপনাকে বাধ্য করবে।

"হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" (মার্চ, ১৯২৭)

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে সমবায়ীকরণের সামাজিক রূপান্তরের উত্তাল জোয়ার ইতিমধ্যেই কোনো কোনো জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং অচিরেই তা গোটা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। এ হচ্ছে

পঞ্চাশ কোটিরও বেশী পল্লী-জনসংখ্যার বিরাটাকারের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলন; এর অত্যন্ত মহান ও বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য রয়েছে। এই আন্দোলনকে আমাদের সক্রিয়, উদ্যমশীল ও সুপরিকল্পিত নেতৃত্ব দিতে হবে এবং কোন না কোন উপায়ে এটাকে পিছনে টানা উচিত নয়। আন্দোলনের মধ্যে কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি অপরিহার্য; এটা বোধগম্য এবং তা শুদ্ধ করাও কঠিন হবে না। আমরা সক্রিয় সাহায্য দিলেই কেডারদের মধ্যে ও কৃষকদের মধ্যে যে ত্রুটি কিংবা ভুল রয়েছে, তা দূর করা বা শুদ্ধ করা যাবে।

"কৃষি-সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

জনসাধারণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বস্তুতঃ অফুরন্ত উদ্যম নিহিত রয়েছে। বিপ্লবী যুগেও যারা শুধু পুরানো গতানুগতিকতাকে অনুসরণ করে চলতেই সক্ষম, তারা এই উদ্যমকে একেবারেই দেখতে পায় না। তারা অন্ধ, তাদের সামনে সবকিছুই

অন্ধকার। এমন কি, কখনো কখনো তারা এত দূর যায় যে, ভুল ও নির্ভুলের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে, এবং দিনকে রাত ক'রে বসে। এই ধরনের লোক আমরা কি কম দেখেছি? যারা শুধু পুরানো গতানুগতিকতা অনুসারে চলে, তারা সবসময়ই জনগণের উদ্যমকে ছোট করে দেখে। নতুন একটা কিছু ঘটলেই, তারা সব সময় তাকে অগ্রাহ্য করে, তাড়াতাড়ি তার বিরোধিতা করতে ছুটে আসে। পরে তাদের পরাজয় মেনে নিতে হয়, একটু আত্মসমালোচনাও করতে হয়। কিন্তু পরের বার আবার নতুন একটা কিছু দেখা দিলে, তারা আগের ধারারই পুনরাবৃত্তি করে চলে। নতুন সব কিছুর ব্যাপারেই তারা এই ধারা অনুসরণ করে। এ ধরনের লোকেরা সব সময়েই নিষ্ক্রিয়। জরুরী মুহূর্তে তারা সর্বদাই নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে এবং পিঠে একটা ধাক্কা না খেয়ে তারা এক পা-ও নড়ে না।

"এই থানা দু'বছরেই সমবায়ের পথে গেছে"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

কুড়ি বছরেরও বেশী কাল ধরে আমাদের পার্টি প্রতিদিন জনসাধারণের মধ্যে কাজ করে আসছে, বিগত দশ বছরের বেশী সময় ধরে তা প্রতিদিনই গণ লাইন সম্পর্কে বলে আসছে। আমরা সব সময়েই এই মত পোষণ করে আসছি যে, বিপ্লবকে অবশ্যই নির্ভর করতে হবে জনসাধারণের উপর, নির্ভর করতে হবে কাজে সকলের হাত লাগানোর উপর; শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক লোকের উপর নির্ভর করে হুকুম জারী করার আমরা বিরোধিতা করে আসছি। কিন্তু কোনো কোনো কমরেডের কাজকর্মে এখনো গণ লাইন পুরোপুরি পালিত হচ্ছে না, এখনো তাঁরা কেবল অল্পসংখ্যক লোকের উপর নির্ভর করে নিঃসঙ্গভাবে কাজ করেন। এর একটা কারণ হচ্ছে এই যে, যা কিছুই তাঁরা করুন না কেন, তাঁদের দ্বারা পরিচালিত লোকের কাছে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে তাঁরা সর্বদা অনিচ্ছুক থাকেন এবং পরিচালিত লোকদের সক্রিয়তাকে ও সৃজনী শক্তিকে কেন ও কিভাবে যে উজ্জীবিত ক'রে তুলতে হবে তা তাঁরা বোঝেন না। নিজের দিক থেকে তাঁরাও চান যে প্রত্যেকেই কাজে হাত লাগাক, কিন্তু কি করতে হবে এবং কেমন করে তা করতে হবে সে বিষয়ে অন্যান্য সবাইকে তাঁরা কিছুই জানতে দেন না। এই রকম অবস্থায়, সবাই কেমন করে কাজে যোগ দিতে পারেন এবং কেমন করেই বা কোন কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হ'তে পারে? এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে মূল কাজ হলো গণ লাইন সম্পর্কে মতাদর্শগত শিক্ষা অবশ্যই দিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু বাস্তব পদ্ধতিও কমরেডদেরকে অবশ্যই শেখাতে হবে।

"শানসী-সুইইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২রা এপ্রিল, ১৯৪৮)

চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে যে, সমস্ত সঠিক কর্তব্য, নীতি ও কর্মরীতি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয় এবং তা অপরিহার্যরূপে জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে দৃঢ় করে

তোলে; আর সমস্ত ভুল কর্তব্য, নীতি ও কর্মরীতিই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার উপযোগী হয় না এবং তা অপরিহার্যরূপে জনসাধারণ থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে। গোঁড়ামিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, হুকুমবাদ, লেজুড়বাদ, সংকীর্ণতাবাদ, আমলাতন্ত্রবাদ এবং কাজকর্মে দাম্ভিক মনোভাবের মতো ব্যাধিগুলো নিশ্চয়ই খারাপ এবং অসহনীয়, যদি কেউ এ ধরনের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে তবে তাকে অবশ্যই এ সব ব্যাধি সারাতে হবে, কারণ এগুলো জনসাধারণ থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

নিজেকে জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হ'লে, জনসাধারণের প্রয়োজন ও ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতেই হবে। জনসাধারণের জন্য যে সব কাজ করা হয় সে সবেরই শুরু হওয়া উচিত জনসাধারণের প্রয়োজন থেকে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের

ইচ্ছা থেকে নয়—তা সেই ইচ্ছা যতই শুভ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হোক না কেন। অনেক সময়ে বাস্তব ক্ষেত্রে যদিও জনসাধারণের কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন, কিন্তু নিজেদের দিক থেকে তাঁরা এখনো সেই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন নন এবং সেই পরিবর্তন সাধনের জন্য এখনো তাঁরা ইচ্ছুক বা দৃঢ়-সংকল্প নন। এই অবস্থায় আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে। যখন আমাদের কাজের ভেতর দিয়ে অধিকাংশ জনসাধারণ এই প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন এবং পরিবর্তন সাধনের জন্য ইচ্ছুক ও দৃঢ়-সংকল্প হয়ে উঠবেন, কেবলমাত্র তখনই আমরা এই ধরনের পরিবর্তন সাধন করবো। অন্যথায়, আমরা জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো। জনসাধারণ সচেতন ও ইচ্ছুক না হ'লে, যে কোনো কাজ, যা'তে জনসাধারণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, তা নিছক আনুষ্ঠানিক মাত্র হয়ে উঠবে এবং ব্যর্থ হবে। ...... এখানে দু'টি নীতি রয়েছে: একটা হচ্ছে জনসাধারণের বাস্তব প্রয়োজন, আমরা যাকে তাঁদের প্রয়োজন বলে কল্পনা করি সে ধরনের প্রয়ো-

জন নয়; আর অন্যটা হচ্ছে জনসাধারণের নিজস্ব আকাংক্ষা, জনসাধারণ নিজেরাই তাঁদের মনস্থির করবেন, তাঁদের হয়ে আমরা যে তাঁদের মনস্থির ক'রে দেবো, তা নয়।

"সাংস্কৃতিক কর্মে যুক্ত ফ্রণ্ট" (৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪)

আমাদের কংগ্রেসের উচিত, সমগ্র পার্টিকে সতর্ক হতে এবং কর্মের প্রত্যেক শাখায় নিয়োজিত প্রতিটি কমরেডই যাতে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন না হন সে দিকে লক্ষ্য রাখতে আহ্বান জানানো। জনসাধারণকে ভালবাসতে এবং জনসাধারণের কথা যত্নের সঙ্গে শুনতে, যেখানেই তিনি যান সেখানেই জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে এক ক'রে মিশিয়ে ফেলতে, জনসাধারণের উপরে দাঁড়ানো নয় বরং তাঁদের মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করতে, জনসাধারণের চেতনার মান অনুসারে তাঁদের চেতনাকে জাগ্রত ও উন্নত করতে এবং স্বেচ্ছার ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে সংগঠিত হতে জনসাধারণকে সাহায্য করতে এবং কোন নির্দিষ্ট স্থান ও কালের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য

অবস্থায় করা চলে এমন সব প্রয়োজনীয় সংগ্রাম ধাপে ধাপে চালনার জন্য সাহায্য করতে প্রত্যেক কমরেডকে শিক্ষাদান করা উচিত।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

যখন জনসাধারণ সচেতন হন নি তখন যদি আমরা আক্রমণ চালাতে চাই, তাহ'লে তা হবে হঠকারিতা। যদি আমরা জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করার জন্য তাঁদেরকে পরিচালিত করতে জেদ ধরি, তা'হলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হবো। জনসাধারণ যখন এগিয়ে যাওয়ার দাবি জানান, তখন যদি আমরা এগিয়ে না যাই, তা'হলে তা হবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ।

"শানসী-সুইইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২রা এপ্রিল, ১৯৪৮)

যে কোনো কাজে হুকুমবাদ অনুসরণ করা ভুল, কারণ তা জনসাধারণের চেতনার মান

ডিঙ্গিয়ে যায় এবং জনসাধারণের স্বেচ্ছা প্রণোদিত কর্মের নীতি লংঘন করে; তা হচ্ছে তাড়াহুড়াবাদের ব্যাধি। আমাদের কমরেডরা যেন এমন মনে না করেন যে তাঁরা নিজেরা যা বুঝেন তা সবই ব্যাপক জনসাধারণও তাঁদের মতো বুঝেন। কোন বিষয় জনসাধারণ বোঝেন কি না এবং তা কার্যকরী করতে ইচ্ছুক কি না, তা সব জানতে পারা যায় শুধু জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে। এমনি করলে, আমরা হুকুমবাদকে এড়াতে পারি। যে কোনো কাজে লেজুড়বাদও ভুল, কারণ এটা জনসাধারণের চেতনার মানের চাইতে পশ্চাৎপদ এবং তাতে জনসাধারণকে পরিচালিত করে এগিয়ে নেবার নীতিও লংঘন করা হয়, এটা হচ্ছে ঢিলেমি-ব্যাধি। আমাদের কমরেডরা অবশ্যই যেন মনে না করেন যে তাঁরা নিজেরা যা এখনো বুঝেন না জনসাধারণও তা বুঝেন না। ব্যাপক জনসাধারণ অনেক সময়েই আমাদের ছাড়িয়ে যান এবং এক পা আগে বাড়াতে অত্যন্ত আগ্রহশীল থাকেন, তথাপি আমাদের কমরেডরা

ব্যাপক জনসাধারণের পরিচালক হতে পারেন না; তাঁরা কিছু সংখ্যক পশ্চাৎপদ ব্যক্তির মতামতের প্রতিফলন করেন এবং এই ধরনের পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের মতামতকে ভুল করে ব্যাপক জনসাধারণের মতামত বলে মনে করেন; ফলে, তাঁরা পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদের লেজুড় হয়ে পড়েন।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

জনসাধারণের ভেতর থেকে মতামত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা, তারপর জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে সেইসব মতামত অধ্যবসায় সহকারে কার্যকরী করা, যাতে করে নেতৃত্বের নির্ভুল মত গড়ে তোলা যায়—এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের মৌলিক পদ্ধতি।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

আমাদের পার্টির সমস্ত বাস্তব কাজকর্মে সমস্ত নির্ভুল নেতৃত্ব অপরিহার্যভাবেই হচ্ছে—জনসাধারণ থেকে নেওয়া এবং জনসাধারণকে দেওয়া। এর অর্থ

হচ্ছে, জনসাধারণের মতামত (ইতস্ততঃ ছড়ানো ও অব্যবস্থিত) সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা (গবেষণার মাধ্যমে সেগুলি কেন্দ্রীভূত ও সুব্যবস্থিত মতে রূপান্তরিত করা), তারপর, সেগুলি নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে প্রচার করা ও ব্যাখ্যা করা যতক্ষণ পর্যন্ত না জনসাধারণ সেগুলি নিজেদের মত বলে গ্রহণ করেন, তাতে অটল থাকেন ও তা কাজে পরিণত করেন এবং এই ভাবে জনসাধারণের কাজের ভেতর দিয়েই এই মত ভুল কি নির্ভুল তা' যাচাই করে নেওয়া। পুনর্বার জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীভূত করা এবং জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়ে তা অধ্যবসায় সহকারে কার্যকরী করা। আর সীমাহীন আবর্তে এইরকম করে চলবে বার বার; এর ফলে প্রতি বারই এই মত হয়ে উঠে আরো বেশী নির্ভুল, আরো বেশী প্রাণবন্ত এবং আরো বেশী সমৃদ্ধ। এই হচ্ছে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব।

ঐ

আমাদের উচিত জনসাধারণের মধ্যে যাওয়া, জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, তাঁদের অভিজ্ঞতার সার-সংক্ষেপ করে সেগুলিকে উত্তম ও সুব্যবস্থিত নীতি ও পদ্ধতিতে পরিণত করা; তারপর, আবার জনসাধারণের মধ্যে গিয়ে সেগুলো প্রচার করা এবং তাঁদের সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে সেই নীতি ও পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য তাঁদেরকে আহ্বান জানানো, এবং মুক্তি ও কল্যাণ অর্জনে তাঁদেরকে সাহায্য করা।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

আমাদের কোনো কোনো স্থানের নেতৃস্থানীয় সংস্থায় এমন লোক রয়েছেন যাঁরা মনে করেন যে পার্টির কর্মনীতিগুলি শুধুমাত্র নেতারা জানলেই চলবে, জনসাধারণকে সেগুলি জানাবার কোনো প্রয়োজন নেই। কেন যে আমাদের কিছু কিছু কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হয় না—এটা তার অন্যতম মৌলিক কারণ।

"শানসী-সুইইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২রা এপ্রিল, ১৯৪৮)

সকল গণ-আন্দোলনেই সক্রিয় সমর্থক, বিরোধী এবং নিরপেক্ষদের সংখ্যার উপরে আমাদেরকে অবশ্যই মৌলিক তদন্ত এবং মৌলিক বিশ্লেষণ চালাতে হবে; ভিত্তিহীন ও আত্মমুখীভাবে সমস্যার সমাধান করলে চলবে না।

"পার্টি-কমিটির কর্মপদ্ধতি" (১৩ই মার্চ, ১৯৪৯)

যে কোনো স্থানের জনসাধারণই সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, মধ্যবর্তী এবং অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। তাই, অল্প-সংখ্যক সক্রিয় ব্যক্তিদেরকে নেতৃত্বের মেরুদণ্ড হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করতে নেতাদের অবশ্যই নিপুণ হতে হবে, এই মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করেই মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের মান উন্নত করতে হবে এবং পশ্চাৎপদ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে হবে।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

পার্টির কর্মনীতিকে জনসাধারণের কর্মকাণ্ডে রূপায়িত করতে নিপুণ হওয়া, আমাদের প্রতিটি আন্দোলন ও প্রতিটি সংগ্রামকে যাতে শুধু নেতৃস্থানীয় কেডাররাই নয় ব্যাপক জনসাধারণও বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারেন সেজন্য চেষ্টা করতে নিপুণ হওয়াই হচ্ছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নেতৃত্বের কর্মকৌশল। আমাদের কর্মে আমরা ভুল করব কি না তা নির্ধারণ করার পার্থক্যরেখাও এটি।

"শানসী-সুইইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২রা এপ্রিল, ১৯৪৮)

নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত গ্রুপ যতই সক্রিয় হোক তা যদি ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয়তার সঙ্গে সংযুক্ত না হয়, তা'হলে সে সক্রিয়তা হয়ে উঠবে অল্পসংখ্যক লোকের নিষ্ফল প্রয়াস। পক্ষান্তরে, যদি কেবল-মাত্র ব্যাপক জনসাধারণের সক্রিয়তা থাকে এবং তাঁদের এই সক্রিয়তাকে যথাযথভাবে সংগঠিত করার জন্য যদি একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব না থাকে,

তা'হলে জনসাধারণের সেই সক্রিয়তা দীর্ঘ দিন টিকে থাকতে পারে না, সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে না এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হতে পারে না।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

জনসাধারণ কর্তৃক উৎপাদন, জনসাধারণের স্বার্থ, জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও মনোভাব—এই সবের দিকে নেতৃস্থানীয় কেডারদের অবশ্যই সতত মনোযোগ দিতে হবে।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ও সামরিক কমিটির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থাগুলোর উৎপাদন প্রদর্শনী উপলক্ষে অন্তর্লেখ, ইয়েনান "মুক্তি দৈনিক" ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪৩

ভূমি ও শ্রম সমস্যা থেকে শুরু করে জ্বালানি, চাল, রান্নার তেল ও লবনের সমস্যা পর্যন্ত জনসাধারণের জীবনের প্রতিটি সমস্যার প্রতি আমাদের

গভীর মনোযোগ দিতে হবে। ...... জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্ত সমস্যাকেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে স্থান দিতে হবে। সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরী করতে হবে এবং তার ফলাফল খতিয়ে দেখতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণকে আমাদের বুঝানো উচিত যে, আমরা তাঁদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করি এবং তাঁদের সঙ্গে আমরা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই সমস্ত বিষয় থেকে নিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে আমাদের উত্থাপিত উচ্চতর কর্তব্যকে, বিপ্লবী যুদ্ধের কর্তব্যকে যেন তাঁদের বুঝানো হয়, যাতে করে তাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং সারা দেশে তা ছড়িয়ে দেন, আমাদের রাজনৈতিক আবেদনে তাঁরা সাড়া দেন এবং বিপ্লবের জয়লাভের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করেন।

"জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন" (২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)

১২. রাজনৈতিক কাজ

সে সময়ে [অর্থাৎ ১৯২৪—১৯২৭ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের সময়—(সম্পাদক)] সৈন্যবাহিনীতে পার্টি-প্রতিনিধির ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ ধরনের ব্যবস্থা চীনের ইতিহাসে আর কখনো গ্রহণ করা হয়নি। এই ব্যবস্থার ফলেই সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছিল। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত লাল ফৌজ ও আজকের অষ্টম রুট বাহিনী, এই ব্যবস্থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে এবং তাকে বিকশিত করেছে।

"বৃটিশ সাংবাদিক জেম্‌স বারট্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার" (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭)

গণযুদ্ধের ভিত্তিতে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যের, কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের মধ্যকার ঐক্যের নীতির ভিত্তিতে এবং শত্রুবাহিনী ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার নীতির ভিত্তিতে গণ-মুক্তি ফৌজ নিজেদের শক্তিশালী বিপ্লবী রাজনৈতিক কাজের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। শত্রুদের পরাজিত করার জন্য এটা হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

"বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

এই সৈন্যবাহিনী গণযুদ্ধের অপরিহার্য রাজনৈতিক কাজের একটা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। এর উদ্দেশ্য হলো আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনীর মধ্যকার ঐক্যকে, মিত্রবাহিনীসমূহ ও জনগণের সঙ্গে আমাদের ঐক্যকে জোরদার করা এবং শত্রুবাহিনী ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া ও যুদ্ধে বিজয়কে সুনিশ্চিত করা।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

রাজনৈতিক কাজ হচ্ছে সমস্ত অর্থনৈতিক কাজের প্রাণসূত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যখন মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তখনি কথাটা বিশেষভাবে সত্য।

"একটা গুরুতর শিক্ষা"-এর ভূমিকা-লিপি (১৯৫৫)

লাল ফৌজ কেন যে অমন দুরূহ অবস্থায় যুদ্ধ করে অবিচ্ছিন্ন র'য়ে গেলো—তার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে "কোম্পানীকে ভিত্তি করে পার্টি-শাখা গঠিত হয়"।

"চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫শে নভেম্বর, ১৯২৮)

অষ্টম রুট বাহিনীর রাজনৈতিক কাজ তিনটি মৌলিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় : প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার ঐক্যের নীতি; এর অর্থ হলো সৈন্যবাহিনী থেকে সামন্ততন্ত্র নির্মূল করা, মারধর ও গালাগাল নিষিদ্ধ করা, সচেতন শৃংখলা গড়ে তোলা এবং সুখদুঃখকে সকলে ভাগ

করে নেওয়া যার ফলে গোটা সৈন্যবাহিনীই হয়ে উঠেছে ঘনিষ্ঠভাবে ঐক্যবদ্ধ। দ্বিতীয়, সৈন্য-বাহিনী ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যের নীতি; এর অর্থ হলো জনসাধারণের স্বার্থের লেশমাত্র লংঘনও নিষিদ্ধ করার শৃংখলাকে বজায় রাখা, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালানো, তাঁদের সংগঠিত করা ও সশস্ত্র করা, তাঁদের অর্থনৈতিক বোঝা হাল্কা করা এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের ক্ষতিসাধনকারী বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহীদের আঘাত করা; এর ফলে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণ হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ এবং জনগণ সর্বত্রই সৈন্যবাহিনীকে স্বাগত জানান। তৃতীয়, শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবার ও যুদ্ধবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করার নীতি। আমাদের বিজয় শুধুমাত্র আমাদের সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধ করার উপরই নির্ভর করে না, তা শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দেবার উপরও নির্ভর করে।

"বৃটিশ সাংবাদিক জেম্‌স বারট্রামের সঙ্গে সাক্ষাৎকার" (২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৭)

সৈন্যবাহিনী ও জনগণের, সৈন্যবাহিনী ও সরকারের, সৈন্যবাহিনী ও পার্টির, অফিসার ও সৈনিকদের, সামরিক কাজ ও রাজনৈতিক কাজের মধ্যকার সম্পর্ক এবং কেডারদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই নির্ভুল নীতি অনুসরণ করতে হবে; কোনো মতেই যুদ্ধবাজ-বাদের ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া চলবে না। অফি-সারদেরকে অবশ্যই সৈনিকদের যত্ন নিতে হবে, তাঁদের প্রতি উদাসীন হওয়া কিংবা তাঁদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া চলবে না; সৈন্যবাহিনী অবশ্যই জনগণকে ভালবাসবে, কখনই তাঁদের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারবে না; সৈন্যবাহিনী অবশ্যই সরকার ও পার্টিকে সম্মান করবে, কোনো ক্রমেই স্বাতন্ত্র্যের দাবি করতে পারবে না।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

জাপানী বাহিনী, তাঁবেদার অথবা কমিউনিস্ট-বিরোধী সৈন্যবাহিনী থেকে ধৃত বন্দীদের সম্পর্কে

আমাদের কর্মনীতি হলো—যারা জনসাধারণের তীব্র ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে এবং উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবার পর যারা অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড পাবে তারা বাদে আর সকলকে মুক্তি দেওয়া। বন্দীদের মধ্যে যারা বাধ্য হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো, কিন্তু যাদের মনো-ভাব কমবেশী বিপ্লবের অনুকূল, আমাদের সৈন্য-বাহিনীর জন্য কাজ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় আমাদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। অবশিষ্ট সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। যদি তারা আবার লড়ে ও ধরা পড়ে, তা'হলেও আবার তাদের ছেড়ে দিতে হবে। তাদের অপমান করা উচিত নয়, তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়া উচিত নয় অথবা তাদের কাছ থেকে অনুশোচনা পত্র নেবার চেষ্টা করাও উচিত নয়, বরং বিনা ব্যতিক্রমে তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ও সদয় ব্যবহার করাই উচিত। তারা যত প্রতিক্রিয়াশীলই হোক না কেন, এই নীতিই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। প্রতি-

ক্রিয়াশীল শিবিরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে এটা খুবই কার্যকরী।

"কর্মনীতি সম্পর্কে" (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪০)

অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, কিন্তু নির্ধারক উপাদান নয়; নির্ধারক উপাদান হচ্ছে মানুষ, বস্তু নয়। শক্তির তুলনা শুধু সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির তুলনাই নয়, বরং জনশক্তি ও নৈতিক শক্তির তুলনাও বটে। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অপরিহার্যরূপেই মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

আণবিক বোমা হচ্ছে কাগুজে বাঘ, জনগণকে ভয় দেখানোর জন্য মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলরা এটা ব্যবহার করে। এটা দেখতে ভয়াবহ, কিন্তু আসলে তা নয়। নিশ্চয়ই, আণবিক বোমা একটা বিরাটাকারের গণ-হত্যার অস্ত্র, কিন্তু যুদ্ধের হার-জিৎকে

জনগণই নির্ধারণ করেন, দু'একটা নতুন ধরনের অস্ত্র নয়।

"মার্কিন সাংবাদিকা আনা লুই স্ট্রংয়ের সাথে আলাপ" (আগষ্ট, ১৯৪৬)

সৈন্যবাহিনীর ভিত্তি হচ্ছে সৈনিক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রেরণার দ্বারা সৈন্যবাহিনীকে অনুপ্রাণিত না করলে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক কাজ না চালালে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সত্যিকারের ঐক্য অর্জন করা অসম্ভব হবে, অসম্ভব হবে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের অনুকূলে অফিসার ও সৈনিকদের উৎসাহকে সর্বাধিক মাত্রায় উদ্দীপিত করা এবং সমস্ত প্রযুক্তি ও রণকৌশল যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য শ্রেষ্ঠতম ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব হবে।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

লাল ফৌজের কোনো কোনো কমরেডের মধ্যে নিছক সামরিক দৃষ্টিকোণ খুবই বিকাশ লাভ করেছে। এটা এই ভাবে আত্মপ্রকাশ করে:

(১) এই সব কমরেড সামরিক বিষয় ও রাজনীতিকে পরস্পর-বিরোধী বলে মনে করেন এবং সামরিক বিষয় যে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদনের অন্যতম যন্ত্র মাত্র, এ কথা তাঁরা অস্বীকার করেন। এমন কি, কেউ কেউ আরো বলেন, ''সামরিক ব্যাপারে ভাল হলে স্বভাবতঃই রাজনীতিতেও আপনি ভাল হবেন, আর সামরিক ব্যাপারে ভাল না হলে রাজনীতিতেও আপনি ভাল হতে পারেন না।'' এটা হলো অতিরিক্ত এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া এবং সামরিক বিষয়কে রাজনীতির উপরে নেতৃত্ব করতে দেওয়া। ....

''পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে'' (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

মতাদর্শগত শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরাটা হচ্ছে গোটা পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে মহান রাজনৈতিক

সংগ্রাম চালানোর মূল চাবিকাঠি। এই কর্তব্য সম্পাদন না করলে পার্টি কোনো রাজনৈতিক কর্তব্যই সম্পন্ন করতে পারে না।

''সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে'' (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

সম্প্রতি, বুদ্ধিজীবী ও যুব-ছাত্রদের মধ্যে মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাজে ভাটা পড়েছে এবং কিছু কিছু অস্বাস্থ্যকর ঝোঁক দেখা দিয়েছে। মনে হয় কিছু কিছু লোক ভাবেন যে, রাজনীতি বা মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ ও মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি মনোযোগ দেবার আর কোনো প্রয়োজন নেই। যেন মার্কসবাদ এক সময়ে বেশ চালু ছিল কিন্তু এখন আর তেমন চালু নয়। এইসব প্রবণতার মোকাবেলা করবার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাজকে জোরদার করতে হবে। বুদ্ধিজীবী ও যুব-ছাত্র উভয়েরই কঠোরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। বিশেষ বিষয়ের অধ্যয়ন ছাড়াও মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই

তাদের অবশ্যই অগ্রগতি লাভ করতে হবে; এর জন্যই মার্কসবাদ, বর্তমান ঘটনাবলী ও রাজনীতি অধ্যয়ন করা তাদের প্রয়োজন। সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ না থাকাটা আত্মা না থাকারই সমান।...... মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক কাজে সব বিভাগকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। কমিউনিস্ট পার্টি, যুব-লীগ, এ কাজের ভারপ্রাপ্ত সরকারী বিভাগ এবং বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালক ও শিক্ষকদের এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

রাজনৈতিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে লাল ফৌজের সৈনিকরা সবাই শ্রেণী-চেতনা লাভ করেছেন এবং জমি-বণ্টন, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা সবাই জানেন যে, তাঁরা লড়ছেন নিজেদের জন্য এবং শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর

জন্য। তাই, তাঁরা তিক্ত সংগ্রামের দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। প্রত্যেকটি কোম্পানী, ব্যাটেলিয়ন ও রেজিমেণ্টে সৈনিক-সমিতি গঠন করা হয়েছে; এই সমিতি সৈনিকদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, রাজনৈতিক কাজ এবং জনসাধারণের মধ্যকার কাজও করে।

"চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫শে নভেম্বর, ১৯২৮)

দুঃখ দুর্দশা (পুরানো সমাজ ও প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্রমজীবী জনগণকে যে দুঃখ-কষ্ট দিয়েছে) সম্পর্কে বলার ও তিনটি যাচাই করার (শ্রেণী ভিত্তি, কর্তব্য সম্পাদন ও সংগ্রামী মনোবলের যাচাই করার) আন্দোলন সঠিকভাবে চালনার ফলে শোষিত শ্রমজীবী জনসাধারণের মুক্তির জন্য, দেশব্যাপী ভূমি-সংস্কার ও জনগণের সাধারণ শত্রু চিয়াং কাই-শেক দস্যুদলের বিনাশসাধনের জন্য গোটা সৈন্য-বাহিনীর কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের সংগ্রামের চেতনা

বিপুল পরিমাণে উন্নত হয়েছিল; একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সব কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের দৃঢ় ঐক্য এর ফলে আরো দৃঢ়তর হয়েছিল। এর ভিত্তিতে, সৈন্যবাহিনীতে অধিকতর বিশুদ্ধতা অর্জিত হয়েছে, শৃংখলা দৃঢ়তর হয়েছে, ব্যাপক সামরিক প্রশিক্ষণ আন্দোলন প্রসার লাভ করেছে এবং সম্পূর্ণ সুপরিচালিত ও সুশৃংখলিতভাবে চালিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক গণতন্ত্র আরো বিকশিত হয়েছে। এই ভাবে সৈন্যবাহিনীর সকলের হৃদয় একই সূত্রে গেঁথে গেছে, প্রত্যেকেই তাঁর ধ্যান ধারণা ও শক্তির অবদান যোগান, আত্মবলিদানকে ভয় করেন না এবং বৈষয়িক অসুবিধা অতিক্রম করেন আর সম্মিলিত বীরত্ব ও দুর্বার সাহস প্রদর্শন করে শত্রুর বিনাশসাধন করেন। এ ধরনের সৈন্যবাহিনীই পৃথিবীতে অজেয়।

"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট বিজয় সম্পর্কে এবং মুক্তি ফৌজের নতুন ধরনের শুদ্ধিকরণ আন্দোলন সম্পর্কে" (৭ই মার্চ, ১৯৪৮)

বিগত কয়েক মাসে গণ-মুক্তি ফৌজের প্রায় সমস্ত ইউনিট লড়াইয়ের মধ্যে যে অবকাশ পেয়েছিল তা ব্যবহার করে ব্যাপক আকারের শুদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণ চালিয়েছিল। এটা চালানো হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সুপরিচালিত, সুশৃংখলিত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। ফলে, এটা ব্যাপক কমাণ্ডার ও যোদ্ধা-সাধারণের বিপ্লবী উৎসাহ উদ্দীপ্ত করে তুলেছে, যুদ্ধের লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে বুঝতে তাঁদের করেছে সমর্থ, সৈন্যবাহিনীতে যে সব ভুল মতাদর্শগত ঝোঁক ও অবাঞ্ছনীয় অভিব্যক্তি দেখা যায় সেগুলোর বিলোপ ঘটিয়েছে, কেডার আর যোদ্ধাদের শিক্ষিত করেছে এবং সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তিকে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন থেকে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও ব্যাপক প্রকৃতির এই নতুন ধরনের শুদ্ধিকরণ আন্দোলনকে আমাদের অবশ্যই অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

"শানসী-সুইইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১লা এপ্রিল, ১৯৪৮)

জাপানবিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজের শিক্ষা নীতি হচ্ছে দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা, কঠোর ও সরল কর্মরীতি এবং নমনীয় রণনীতি ও রণকৌশল। জাপানবিরোধী বিপ্লবী সৈন্য গড়ে তোলার জন্য এই তিনটি অপরিহার্য। কলেজের কর্মচারী, শিক্ষক ও ছাত্ররা এই তিনটা উপাদান অনুসারে শিক্ষা দেন ও শেখেন।

"শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়া ভাল, খারাপ নয়" (২৬শে মে, ১৯৩৯)

কঠোর সংগ্রামের একটা ঐতিহ্যগত রীতি আমাদের জাতির সর্বদাই রয়েছে; এটাকে আমাদের বিকশিত করতে হবে। ...... এর থেকেও বড় কথা হচ্ছে, দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশার পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদাই প্রচার করে আসছে। ...... কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতি থেকে এই দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা অবিচ্ছেদ্য। দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা না থাকলে কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতিকে উদ্দীপ্ত করা অসম্ভব; আবার

কঠোর সংগ্রামের কর্মরীতি না থাকলে দৃঢ় ও নির্ভুল রাজনৈতিক দিশা ঠিক রাখাও অসম্ভব।

"আন্তর্জাতিক শ্রম-দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ইয়েনান সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ" (১লা মে, ১৯৩৯)

ঐক্যবদ্ধ, সতর্ক, ভাব-গম্ভীর ও প্রাণবন্ত হোন।

জাপানবিরোধী সামরিক ও রাজনৈতিক কলেজের আদর্শ-বাণী

পৃথিবীতে যার সত্যিই মূল্য আছে তা হ'ল গভীর মনোযোগ, আর কমিউনিস্ট পার্টি মনোযোগী হবার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী যত্নবান।

মস্কোতে চীনা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানবীশদের সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

১৩. অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক

আমাদের সৈন্যবাহিনীতে সর্বদাই দু'টি কর্মনীতি অনুসৃত হয়ে এসেছে: প্রথম, শত্রুদের প্রতি আমাদের অবশ্যই নির্মম হতে হবে, তাদের দাবিয়ে রাখতে হবে এবং ধ্বংস করতে হবে; দ্বিতীয়, নিজেদের প্রতি, জনগণের প্রতি, কমরেডদের প্রতি, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের প্রতি স্নেহশীল হতে হবে এবং তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

রিয়ার আর্মি ডিট্যাচমেণ্ট থেকে আগত আদর্শ-শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদের সম্মানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক আয়োজিত সম্বর্ধনায় প্রদত্ত ভাষণ (১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

আমরা দেশের প্রতিটি স্থান থেকে এসেছি এবং একই বিপ্লবী উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য একত্রিত হয়েছি। ...... আমাদের কেডারদেরকে প্রত্যেকটি সৈনিকের প্রতি যত্নবান হতে হবে, বিপ্লবী বাহিনীর সমস্ত লোককেই পরস্পরের যত্ন নিতে হবে, পরস্পরকে ভালবাসতে হবে ও সাহায্য করতে হবে।

"জনগণের সেবা কর" (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

সৈন্যবাহিনীর প্রতি ইউনিটে কেডারদের সমর্থন করার জন্য ও সৈনিকদের ভালবাসার জন্য একটা আন্দোলন চালাতে হবে; সৈনিকদের ভালবাসার জন্য কেডারদের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং একই সময়ে কেডারদেরকে সমর্থন করার জন্য সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। পরস্পরের ভুল-ত্রুটি তাঁদের খোলাখুলিভাবে বলা উচিত এবং তাড়াতাড়ি সে সব ভুল-ত্রুটি সংশোধন ক'রে নেওয়া উচিত। এই ভাবে তাঁরা একটা চমৎকার আভ্যন্তরীণ ঐক্য অর্জন করতে পারবেন।

"১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

অনেকে মনে করেন যে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক অসন্তোষজনক হবার কারণ হচ্ছে ভুল পদ্ধতি; আমি সব সময়েই তাঁদের বলি যে, এটা হচ্ছে মৌলিক মনোভাবের (অথবা মৌলিক নীতির) প্রশ্ন; এই মনোভাব হচ্ছে সৈনিক ও জনগণকে সম্মান করা। এই মনোভাব থেকে বিভিন্ন কর্মনীতি, পদ্ধতি ও রীতির উদ্ভব ঘটে। যদি এই মনোভাব থেকে দূরে সরে যাই, তা'হলে কর্মনীতি, পদ্ধতি ও রীতিতে নিশ্চয়ই ভুল হবে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক অবশ্যই অসন্তোষজনক হবে। সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক কাজে আমাদের তিনটি প্রধান নীতি হচ্ছে: প্রথম, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য; দ্বিতীয়, সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে ঐক্য; তৃতীয়, শত্রুবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করা। এই নীতিগুলোকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার জন্য সৈনিকদের সম্মান করার, জনগণকে সম্মান করার এবং শত্রুবাহিনীর যে সব যুদ্ধবন্দীরা একবার অস্ত্র পরিত্যাগ করেছে তাদের মানবিক মর্যাদাকে সম্মান করার মৌলিক মনোভাব থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে। যাঁরা এটাকে মৌলিক মনোভাবের প্রশ্ন বলে মনে করেন না বরং টেকনিক্যাল প্রশ্ন বলে মনে করেন, তাঁরা বাস্তবিকই ভুল করছেন, তাঁদের মতামতকে সংশোধন করা দরকার।

''দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে'' (মে, ১৯৩৮)

শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে কাজ করার সময়ে কমিউনিস্টদের অবশ্যই বুঝিয়ে বলার ও শিক্ষাদানের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং তাঁরা কোনো মতেই হুকুমবাদী মনোভাব ও বাধ্য করার পদ্ধতি অবলম্বন করবেন না। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি বিশ্বস্তার সঙ্গে পালন করছে।

''জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে'' (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমাদের কমরেডদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, মতাদর্শগত পুনর্গঠন হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী, ধৈর্যসাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য কাজ; কয়েক দশক বছরের জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে মানুষের মধ্যে যে মতাদর্শ গ'ড়ে উঠেছে তাকে ক্লাসে কয়েকটি মাত্র বক্তৃতা দিয়ে বা সভা করে বদলে দেবার চেষ্টা তাঁরা অবশ্যই করবেন না। কারো মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার একমাত্র পন্থা হলো বুঝিয়ে বলা, চাপ দেওয়া নয়। চাপ দিলে কখনই কারো মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা যাবে না। মানুষকে বিশ্বাসী করে তুলতে হলে বলপ্রয়োগ করা চলবে না। শত্রুদের প্রতি এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে, কিন্তু কমরেড ও বন্ধুদের প্রতি কোনো মতেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করা চলবে না।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ"
(১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

শত্রু ও আমাদের মধ্যে স্পষ্টভাবে পার্থক্য করা প্রয়োজন, বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ ক'রে শত্রুর প্রতি

যেমন আচরণ করা হয়, কমরেডদের প্রতি তেমন ব্যবহার করা চলবে না। বুকভরা উৎসাহের সঙ্গে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করার এবং জনগণের চেতনাকে উন্নত করার মনোভাব নিয়ে কথা বলা দরকার, উপহাস কিংবা আক্রমণের মনোভাব নিয়ে কথা বলা চলবে না।

ঐ

১৪. সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক

সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যেতে হবে, যাতে করে জনসাধারণ সৈন্যবাহিনীকে তাঁদের নিজেদের সৈন্যবাহিনী বলে মনে করেন। এই ধরনের সৈন্যবাহিনী পৃথিবীতে হবে অপরাজেয়, ...

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

প্রত্যেকটি কমরেডকে অবশ্যই বুঝাতে হবে যে, যদি আমরা জনগণের উপর নির্ভর করি, জনসাধারণের অফুরন্ত সৃজনী শক্তিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখি আর এ কারণেই জনগণের উপর আস্থা রেখে

তাঁদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাই, তা'হলে যে কোনো বাধা-বিপত্তিকেই আমরা অতিক্রম করতে পারবো এবং কোনো শত্রুই আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না, বরং আমরাই তাদের ধ্বংস করব।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

আমাদের কমরেডরা যে কোনো স্থানেই যান না কেন, সেখানে অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, জনসাধারণের যত্ন নিতে হবে এবং বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য জনসাধারণকে সাহায্য করতে হবে। ব্যাপক জনগণের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, জনগণের সঙ্গে যত বেশী আমরা ঐক্যবদ্ধ হই ততই ভাল।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

মুক্ত এলাকায়, একদিকে সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই সরকারকে সমর্থন করতে হবে ও জনগণকে

ভালবাসতে হবে, অপর দিকে সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধে নিরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার কাজে গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই জনগণের নেতৃত্ব করতে হবে। এইভাবে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্ক আরো বেশী ভাল হয়ে উঠবে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

সৈন্যবাহিনীতে প্রত্যেক কমাণ্ডার ও যোদ্ধাদের অবশ্যই মতাদর্শগত শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে করে তাঁরা সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার গুরুত্বটা পুরোপুরি বুঝতে পারেন। যদি সৈন্যবাহিনী নিজেদের দিক থেকে এই কাজ ভালভাবে করে, তা'হলে স্থানীয় পার্টি সংগঠন, স্থানীয় সরকারী সংস্থা ও জনগণ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক আরো উন্নত করতে পারবেন।

"মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার এবং সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধে নিরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার আন্দোলনে সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের পক্ষ থেকে এবং পার্টি ও সরকারকেও তাদের পক্ষ থেকে ১৯৪৩ সালের ভুল-ত্রুটি পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করা উচিত এবং ১৯৪৪ সালে দৃঢ়ভাবে সেগুলো সংশোধন করা উচিত। এখন থেকে প্রতি চান্দ্র বছরের প্রথম মাসে এ ধরনের আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে এবং সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার প্রতিজ্ঞা এবং সৈন্যবাহিনীকে সমর্থন করার ও জাপানবিরোধী যুদ্ধে নিরত সৈন্যদের পরিবারের প্রতি বিশেষ যত্ন নেবার প্রতিজ্ঞা বারবার ঘোষণা করতে হবে। ঘাঁটি এলাকায় পার্টি, সরকার ও জনগণের প্রতি সৈন্যবাহিনী যেসব উদ্ধত ব্যবহার করেছিল এবং পার্টি, সরকার ও জনগণের মধ্যে সৈন্যবাহিনীর প্রতি যত্নের যেসব অভাব ঘটেছিল, সেই সব ভুল-ত্রুটির জন্য বারবার ব্যাপক এবং খো-

লাখুলিভাবে আত্মসমালোচনা করতে হবে (প্রত্যেক পক্ষ শুধু নিজেদের সমালোচনাই করবে, অপর পক্ষের সমালোচনা নয়) যাতে করে ভুল-ত্রুটিগুলো পুরোপুরি সংশোধন করা যায়।

"ঘাঁটি এলাকায় খাজনা কমিয়ে দেবার, উৎপাদন বৃদ্ধি করার এবং সরকারকে সমর্থন করার ও জনগণকে ভালবাসার আন্দোলন প্রসারিত করুন" (১লা অক্টোবর, ১৯৪৩)

১৫. প্রধান তিনটি ক্ষেত্রে গণতন্ত্র

যথাযথ পরিমাণে একটা গণতন্ত্র সৈন্যবাহিনীতে কার্যকরী করতে হবে। তা করতে হবে প্রধানতঃ সামন্ততান্ত্রিক মারধর, গালাগালের ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে এবং অফিসার ও সৈনিকদের সকলে এক সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ ক'রে নিয়ে। এমনি করলেই, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ঐক্য অর্জিত হবে, সৈন্যবাহিনীর সংগ্রামী শক্তি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে যাবে এবং দীর্ঘ ও নির্মম যুদ্ধে আমরা যে টিকতে পারবো, তাতে কোনো সন্দেহ থাকবে না।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

এত শোচনীয় বৈষয়িক অবস্থা ও ঘন ঘন যুদ্ধ সত্ত্বেও লাল ফৌজ যে দৃঢ়ভাবে টিকতে সক্ষম হয়েছে

তার কারণ, পার্টির ভূমিকা ছাড়াও সৈন্যবাহিনীর ভেতরে পালন করা হচ্ছে গণতান্ত্রিক নীতি। অফিসাররা সৈনিকদের মারধর করেন না, অফিসার ও সৈনিকদের প্রতি সমান ব্যবহার করা হয়, সভা করার ও কথা বলার স্বাধীনতা সৈনিকদের আছে, তুচ্ছ আনুষ্ঠানিকতা বাতিল করা হয়েছে এবং টাকা-পয়সার হিসেব সকলের সামনে খোলা আছে।...... চীনে জনগণের যেমন গণতন্ত্র দরকার তেমনি সৈন্যবাহিনীরও গণতন্ত্রের দরকার। সৈন্যবাহিনীতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীকে ভেঙ্গে দেবার জন্য একটা গুরুত্ব-পূর্ণ অস্ত্র।

"চিংকাং পাহাড়ে সংগ্রাম" (২৫শে নভেম্বর, ১৯২৮)

কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনটি প্রধান লক্ষ্য—উচ্চমাত্রার রাজনৈতিক ঐক্য, উন্নততর জীবন-যাত্রা এবং সামরিক ক্ষেত্রে উন্নততর প্রয়োগকৌশল ও রণকৌশল অর্জন করার উদ্দেশ্যে সৈনিকসাধারণ, কমাণ্ডার ও সমস্ত কর্মীকে পুরোপুরি জাগ্রত করাই হলো সৈন্যবাহিনীর ভিতরে আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কর্মনীতি। আমাদের সৈন্যবাহিনীর ইউনিটগুলোতে বর্তমানে যে 'তিনটি যাচাই' ও 'তিনটি শুদ্ধি' উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে উপরোক্ত এই তিনটি প্রধান লক্ষ্যের প্রথম দু'টি অর্জন করা।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ব্যাপারে, কোম্পানীর সরবরাহ ও খাবার ব্যবস্থা পরিচালনার কাজে কোম্পানীর পরিচালকদেরকে সাহায্য করার জন্য (কিন্তু তাঁদের ছাড়িয়ে যেতে নয়) সৈনিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকারটা অবশ্যই সুনিশ্চিত করতে হবে।

সামরিক গণতন্ত্রের ব্যাপারে, সৈন্যদের প্রশিক্ষণের সময়ে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে এবং সৈনিকদের নিজেদের মধ্যে অবশ্যই পরস্পরকে

শেখাতে হবে; আবার যুদ্ধের সময়ে ফ্রণ্টে অবস্থিত কোম্পানীগুলো বিভিন্ন ধরনের ছোট বড় সভা করবে। কি করে আক্রমণ করে শত্রুর অবস্থান দখল করে নেওয়া যায় এবং কি করে যুদ্ধের অন্যান্য কর্তব্য পালন করা যায় তা আলোচনার জন্য কোম্পানীর পরিচালকদের নেতৃত্বে সৈনিকসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। যুদ্ধ একটানা কয়েক দিন ধ'রে চললে, এ ধরনের কয়েকটি সভা করতে হবে। উত্তর সেনসীর পানলোং যুদ্ধে এবং শানসী-ছাহার-হোপেই এলাকার শিচিয়াচুয়াংয়ের যুদ্ধে এই ধরনের সামরিক গণতন্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং তাতে খুব বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয়েছে, সামরিক গণতন্ত্রে শুধু উপকারই হতে পারে, কোন অপকার হতে পারে না।

"সৈন্যবাহিনীর ভেতরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন" (৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮)

বর্তমানের মহান সংগ্রামে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি দাবি করে যে, গোটা পার্টির সকল নেতৃস্থানীয় সংস্থা, পার্টি-সদস্য ও কেডারদের উচিত তাঁদের উদ্যোগকে পরিপূর্ণভাবে স্ফুরণ করা; শুধু এমনি করেই বিজয় নিশ্চিত করা যায়। বাস্তবে এই উদ্যোগ প্রদর্শন করতে হবে নেতৃস্থানীয় সংস্থা, কেডার ও পার্টি-সদস্যদের সৃজনশীল ক্ষমতায়, দায়িত্ব কাঁধে নেবার প্রস্তুতিতে, কর্মে তাঁরা যে উচ্ছ্বসিত উৎসাহ দেখান তাতে এবং প্রশ্ন উত্থাপন, মত প্রকাশ ও ত্রুটির সমালোচনায় তাঁদের সাহসে ও নৈপুণ্যে এবং নেতৃস্থানীয় সংস্থা ও নেতৃস্থানীয় কেডারদের উপর সস্নেহ নজর রেখে। অন্যথায়, "উদ্যোগ" হয়ে পড়বে একটা ফাঁকা বুলি। আর এইরূপ উদ্যোগের স্ফুরণ নির্ভর করে পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনের গণতান্ত্রিকীকরণের উপর। পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবনের অভাব থাকলে এইরূপ উদ্যোগের স্ফুরণ অসম্ভব। কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক জীবনের পরিবেশেই বিপুল-সংখ্যক সক্ষম মানুষকে সামনে টেনে আনা যায়।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

যে কেউ হোক না কেন সে শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি না হলে, কু-উদ্দেশ্যমূলক আক্রমণ না চালালে, তাকে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে, সে যদি ভুলও বলে তাতেও কিছু আসে যায় না। সর্বস্তরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদেরই দায়িত্ব হলো অন্যান্যদের কথা শোনা। দু'টি নীতি মেনে চলতে হবে : (১) যা জানেন বলুন, এবং সবটাই বলুন ; (২) বক্তাকে দোষ দেবেন না, তাঁর কথাকে সতর্কবাণী হিসেবে গ্রহণ করুন। "বক্তাকে দোষ দেবেন না" এই নীতিটিকে না মানলে এবং সত্যিকারভাবে ও অকৃত্রিমভাবে না মানলে, "যা জানেন বলুন, এবং সবটাই বলুন"—এতে ফল হবে না।

"১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শিক্ষার কাজ অবশ্যই চালাতে হবে যাতে করে পার্টি-সদস্যরা বুঝতে পারেন, গণতান্ত্রিক জীবনের অর্থ

কি, গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার মধ্যকার সম্পর্ক কি এবং কি ভাবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র এই উপায়েই, একদিকে পার্টির ভেতরে গণতান্ত্রিক জীবনকে সত্যি সত্যি প্রসারিত করা সম্ভব, অন্য দিকে, অতি-গণতন্ত্র ও শৃংখলা লংঘনকারী উদারনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতাকে এড়ানো সম্ভব।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

সৈন্যবাহিনী ও স্থানীয় সংস্থাসমূহে—উভয় ক্ষেত্রেই পার্টির আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রকে চালু রাখার উদ্দেশ্য হলো শৃংখলা দৃঢ়তর করা এবং সংগ্রামী শক্তিকে বাড়িয়ে তোলা, সেগুলিকে দুর্বল করা নয়।

ঐ

তত্ত্বের ক্ষেত্রে অতি-গণতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করুন। প্রথমে, এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, অতি-

গণতন্ত্রের বিপদ হচ্ছে : পার্টি সংগঠনের ক্ষতি করা, এমন কি তার পুরোপুরি সর্বনাশ সাধন করা এবং পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে দুর্বল করা, এমন কি তার পুরোপুরি ধ্বংস সাধন করা, পার্টিকে তার সংগ্রামের দায়িত্ব বহনে অক্ষম করে ফেলা; এর ফলে, বিপ্লবের পরাজয় ডেকে আনা হয়। তারপরে, এটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত যে, অতি-গণতন্ত্রের উৎস রয়েছে শৃংখলার প্রতি পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্মকেন্দ্রিক বিমুখতার মধ্যে। এটাকে পার্টির ভেতরে টেনে আনলেই, তা রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে অতি-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় রূপলাভ করে। সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী কর্তব্যের সঙ্গে এই ভাবধারা একেবারেই অসঙ্গতিপূর্ণ।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

১৬. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

আমাদের শিক্ষা নীতি এমন হওয়া উচিত যাতে শিক্ষাপ্রাপ্তরা নৈতিকভাবে, বুদ্ধিগতভাবে এবং শারীরিকভাবে বিকাশলাভ করতে পারেন এবং সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

কর্মরত বা কেডার-স্কুলে শিক্ষারত কেডারদের শিক্ষা সম্পর্কে এমন একটা কর্মনীতি প্রতিষ্ঠা করা

উচিত যাতে উক্ত শিক্ষায় চীনা বিপ্লবের বাস্তব সমস্যার অধ্যয়নকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতিকে পথপ্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আর মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে নিশ্চল ও বিচ্ছিন্নভাবে গবেষণা করার পদ্ধতি ত্যাগ করা হয়।

"আমাদের অধ্যয়ন সংস্কার করুন" (মে, ১৯৪১)

একটা সামরিক স্কুলের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে স্কুলের একজন পরিচালক ও শিক্ষকবৃন্দ বাছাই করা এবং একটা শিক্ষা নীতি নির্ধারণ করা।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

কয়েকজন অথবা দশ-বিশজন লোক নিয়ে গঠিত নেতৃগোষ্ঠী না থাকলে, এক শ' লোকের একটা স্কুলকে নিশ্চয়ই ভালভাবে চালানো যায় না; এই

নেতৃগোষ্ঠী গঠিত হয় বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে (কৃত্রিমভাবে একত্র জড় করে নয়) শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সক্রিয়, সৎ ও সুচতুর তাঁদের নিয়ে।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

আমাদের গোটা সৈন্যবাহিনীর অফিসার ও সৈনিকদের অবশ্যই তাঁদের সামরিক কলাকৌশলের উন্নতি করতে হবে, যুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের উদ্দেশ্যে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং সমস্ত শত্রুকে দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে, পুরোপুরি ও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।

"চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের ইস্তাহার" (অক্টোবর, ১৯৪৭)

শুদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণের এক বছরের যে পরি-কল্পনা বর্তমানে শুরু হয়েছে তার মধ্যে সামরিক ও রাজনৈতিক দু'টি দিকের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে

হবে, আর এ দু'টিকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। শুরুতে, গুরুত্ব দিতে হবে রাজনৈতিক দিকে, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতির দিকে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য দৃঢ় করার দিকে, আর কেডার ও সৈনিকসাধারণের উদ্দীপনাকে উচ্চস্তরে উন্নীত করার দিকে। শুধুমাত্র এইভাবেই সামরিক শুদ্ধিকরণ ও প্রশিক্ষণ স্বচ্ছন্দে এগুতে পারে এবং আরো বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে।

"১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

সৈন্যদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতির ব্যাপারে বক্তব্য হলো, আমাদের ব্যাপক প্রশিক্ষণ আন্দোলন চালানো উচিত; এই আন্দোলনে অফিসাররা সৈনিকদের শেখান, সৈনিকরা অফিসারদের শেখান এবং সৈনিকরা পরস্পরকে শেখান।

"মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

সৈন্যদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদের শ্লোগান হলো : "অফিসাররা সৈনিকদের শেখান, সৈনিকরা অফিসারদের শেখান এবং সৈনিকরা পরস্পরকে শেখান।" যোদ্ধাদের অনেক বাস্তব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে। যোদ্ধাদের কাছ থেকে অফিসারদের শিখতে হবে, অন্যদের অভিজ্ঞতাকে আপন করে নিলে তাঁরা আরো বেশী দক্ষ হবেন।

"শানসী-সুইইউয়ান দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা" (২রা এপ্রিল, ১৯৪৮)

সৈন্যদের প্রশিক্ষণের কার্যক্রমের ব্যাপারে বক্তব্য হলো, এখনো প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে গুলিবর্ষণ, সংগীন চালনা, হাতবোমা নিক্ষেপ প্রভৃতির প্রয়োগকৌশলের মান উন্নত করা, আর গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে রণকৌশলের মান উন্নত করা, এবং নৈশ যুদ্ধের অনুশীলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া।

"মুক্ত এলাকায় ১৯৪৬ সালের জন্য কাজের নীতি" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

১৭. জনগণের সেবা করা

আমাদের বিনয়ী ও সতর্ক হতে হবে, অহঙ্কার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে এবং মনেপ্রাণে চীনা জনগণের সেবা করতে হবে, ...

"চীনের দু'টি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ" (২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

মনেপ্রাণে জনগণের সেবা করা, এক মুহূর্তের জন্যও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া; সব ব্যাপারই জনগণের স্বার্থ থেকে শুরু করা, ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোনো ক্ষুদ্র চক্রের স্বার্থ থেকে নয়; জনগণের প্রতি দায়িত্বকে পার্টির নেতৃস্থানীয় সংস্থার প্রতি আমাদের দায়িত্বের সঙ্গে এক করে

মিশিয়ে ফেলা; এ সকলই হচ্ছে আমাদের কাজের প্রারম্ভিক বিন্দু।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং জনসাধারণের উপর নির্ভর করতে হবে; রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর কর্মীদের অবশ্যই জনগণের সেবা করতে হবে।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

কমরেড বেথুন লেশমাত্রও আত্মচিন্তা না ক'রে অপরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন; তাঁর এই ভাব-মানস অভিব্যক্তি লাভ করেছে তাঁর অসীম দায়িত্ববোধের মধ্যে এবং কমরেড ও জনগণের প্রতি তাঁর অসীম সহৃদয়তার মধ্যে। প্রত্যেক

কমিউনিস্টেরই তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

....

আমাদের সবারই তাঁর সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাব-মানস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এই ভাব-মানস থাকলে সকলেই জনগণের পক্ষে খুবই হিতকর হতে পারেন। একজন মানুষের যোগ্যতা বেশী অথবা কম হতে পারে, কিন্তু এই ভাব-মানস থাকলে তিনি হতে পারেন মহাপ্রাণ লোক, খাঁটি লোক, নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন লোক, নীচ রুচি থেকে মুক্ত লোক ও জনগণের জন্য হিতকর লোক।

"নর্ম্যান বেথ্যুনের স্মরণে" (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনী হচ্ছে বিপ্লবী বাহিনী। আমাদের এই বাহিনী জনগণের মুক্তির জন্য সম্পূর্ণরূপে

উৎসর্গপ্রাণ এবং সর্বান্তঃকরণে জনগণের স্বার্থের জন্য কাজ করে।

"জনগণের সেবা কর" (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

আমাদের সকল কেডারই জনগণের সেবক তা তাঁদের পদমর্যাদা যাই হোক না কেন, এবং যা কিছু আমরা করি তা জনগণের সেবার জন্যই করি। তাই আমাদের নিজেদের মধ্যে যা খারাপ তা আমরা কেন ত্যাগ করতে পারবো না?

"১৯৪৫ সালের কর্তব্য" (১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের কাছে দায়িত্ব-শীল হওয়া। প্রতিটি কথা, প্রতিটি কার্যক্রিয়া, প্রতিটি কর্মনীতি সবই জনগণের স্বার্থের অনুকূল হওয়া উচিত; যদি ভুল হয়, তা'হলে অবশ্যই তা

সংশোধন করতে হবে; এটাকেই বলে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল হওয়া।

"জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি" (১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৫)

যেখানেই সংগ্রাম সেখানেই ত্যাগ অনিবার্য, এবং মৃত্যু সেখানে সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আমাদের অন্তরে রয়েছে জনগণের স্বার্থ এবং বিরাট সংখ্যাগুরু জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা; আর যখন আমরা জনগণের জন্য মৃত্যু বরণ করি তখন আমাদের মৃত্যু সার্থক হয়। তবু অনাবশ্যক প্রাণদানের সংখ্যা কমানোর জন্য আমাদের যথাসম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

"জনগণের সেবা কর" (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

মানুষের মৃত্যু অবশ্যই হয়, কিন্তু মৃত্যুর তাৎপর্য বিভিন্ন রকমের। প্রাচীন চীনে সিমা ছিয়ান নামক

একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, "মানুষের মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু তার তাৎপর্য হতে পারে থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী বা বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা।" জনগণের জন্য যিনি মৃত্যু বরণ করেন, তাঁর মৃত্যু থাই পাহাড়ের চেয়েও ভারী; কিন্তু যে লোক ফ্যাসিস্টদের জন্য খাটে অথবা জনগণের শোষণকারী ও জনগণের অত্যাচারীদের জন্য মরে, তার মৃত্যু বেলে হাঁসের পালকের চেয়েও হাল্কা।

ঐ

১৮. দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদ

একজন কমিউনিস্ট যিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী, একই সময়ে তিনি কি আবার দেশপ্রেমিকও হতে পারেন? আমরা মনে করি, তিনি যে তা কেবল হতে পারেন, তাই নয়, তাঁকে তা হতেই হবে। দেশপ্রেমের নির্দিষ্ট অন্তর্বস্তু ঐতিহাসিক অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হয়। জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের "দেশপ্রেম" আছে, আবার আমাদেরও দেশপ্রেম আছে। কমিউনিস্টদের অবশ্যই জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের তথাকথিত "দেশপ্রেমের" দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করতে হবে। তাঁদের দেশের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে

জাপান ও জার্মানির কমিউনিস্টরা হচ্ছেন পরাজয়বাদী। প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের পরাজয় ঘটানোটাই হচ্ছে জাপানী ও জার্মান জনগণের স্বার্থের অনুকূল; এই পরাজয় যত পূর্ণাঙ্গ হয় ততই ভাল। ...... কারণ, জাপানী আক্রমণকারীদের ও হিটলারের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধ কেবল যে বিশ্বের জনগণের ক্ষতি করছে তাই নয় উপরন্তু তা তাদের নিজেদের দেশের জনগণেরও ক্ষতি করছে। চীনের অবস্থা কিন্তু ভিন্ন, কারণ চীন হচ্ছে আক্রান্ত দেশ। কাজেই, চীনা কমিউনিস্টদের অবশ্যই আন্তর্জাতিকতাবাদের সঙ্গে দেশপ্রেমকে মিশিয়ে দিতে হবে। আমরা হচ্ছি একই সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদী ও দেশপ্রেমিক দুই-ই, আর আমাদের শ্লোগান হলো—মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। আমাদের পক্ষে, পরাজয়বাদ হচ্ছে অপরাধ, এবং জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে জয় লাভের চেষ্টা করাটা হচ্ছে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ, মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করেই কেবল আমরা

আক্রমণকারীদের পরাজিত করতে পারি এবং জাতীয় মুক্তি অর্জন করতে পারি। আর জাতীয় মুক্তি অর্জন করেই কেবল সর্বহারাশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে নিজেদের মুক্তি অর্জন সম্ভব হবে। চীনের বিজয় এবং চীনের উপর আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদীদের পরাজয় অন্যান্য দেশের জনগণকে সাহায্য করবে। তাই, জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে দেশপ্রেম হলো ব্যবহারিক আন্তর্জাতিকতাবাদ।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

একজন বিদেশী হয়েও তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ-ভাবে চীনা জনগণের মুক্তির স্বার্থকে নিজের বলে মনে করতেন; এটা কি ধরনের ভাব-মানস? এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিকতাবাদের ভাব-মানস, এটা হচ্ছে কমিউনিজমের ভাব-মানস; চীনা কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যেক সদস্যকেই এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ...... সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারা-

শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে—জাপান, ব্রিটেন, আমেরিকা, জার্মানি, ইতালী ও অন্যান্য সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শুধু এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদকে নিপাত করা যাবে, আমা-দের জাতি ও জনগণ এবং বিশ্বের অন্যান্য জাতি ও জনগণের মুক্তি অর্জন করা যাবে। এটাই হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ; এই আন্তর্জাতিকতা-বাদ দিয়ে আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সংকীর্ণ দেশপ্রেমের বিরোধিতা করি।

"নর্ম্যান বেথ্যুনের স্মরণে" (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

পূর্ণ মুক্তি অর্জনের জন্য নিপীড়িত জনগণ সর্বপ্রথমে নির্ভর করেন তাঁদের নিজেদের সংগ্রামের উপর এবং তারপর, কেবলমাত্র তারপরেই নির্ভর করেন আন্তর্জাতিক সাহায্যের উপর। যে জনগণ নিজেদের বিপ্লবে জয় লাভ করেছেন, তাঁদেরকে

এখনো যাঁরা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন এমন সব জনগণকে সাহায্য করতেই হবে। এটা হচ্ছে আমাদের আন্তর্জাতিকতাবাদী কর্তব্য।

আফ্রিকান বন্ধুদের সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ (৮ই আগষ্ট, ১৯৬৩)

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরনের রাষ্ট্র। এসব দেশে শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং শ্রমজীবী জনগণ ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। এই দেশগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিকতাবাদকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নীতি পালন করা হয়। একই স্বার্থ, একই আদর্শ আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

"মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (৬ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সকল দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সকল দেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশের জনগণের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, সমস্ত শান্তিকামী দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, মার্কিন আক্রমণ, নিয়ন্ত্রণ, হস্তক্ষেপ ও উৎপীড়নের শিকার এমন সব দেশের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, এবং এইভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণাত্মক নীতি ও যুদ্ধ নীতির বিরোধিতা করার জন্য ও বিশ্বশান্তি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতম যুক্ত ফ্রণ্ট গড়ে তোলা উচিত।

"মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পানামার জনগণের ন্যায়সঙ্গত দেশপ্রেমমূলক সংগ্রামের সমর্থনে প্রদত্ত বিবৃতি" (১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪)

বস্তু অবিরাম বিকাশ লাভ করে। ১৯১১ সালের বিপ্লব, অর্থাৎ সিনহাই বিপ্লবের পর থেকে মাত্র

৪৫ বছর অতীত হয়েছে, অথচ এর মধ্যেই চীনের চেহারাটা একেবারেই বদলে গেছে। আরো ৪৫ বছর কেটে গেলে, অর্থাৎ ২০01 সালে অথবা একুশ শতকের শুরুতে চীনের চেহারায় আরো বেশী পরিবর্তন ঘটবে। চীন হয়ে উঠবে একটা শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিল্পপ্রধান দেশ। চীনের এমনটাই হওয়া উচিত। কারণ, চীন হচ্ছে এমন একটা দেশ যার আয়তন ৯,৬00,000 বর্গ কিলোমিটার আর যার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৬0 কোটি; মানবজাতির প্রতি চীনের অবশ্যই অপেক্ষাকৃত বিরাট অবদান থাকা উচিত। কিন্তু অতীতে দীর্ঘকাল ধরে তার এই ধরনের অবদান খুবই কম। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

কিন্তু, আমাদের অবশ্যই বিনয়ী হতে হবে। শুধু এখনি নয়, ৪৫ বছর পরেও, আমাদের এমনি বিনয়ী থাকতে হবে। আমাদের সবসময় বিনয়ী হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, চীনা জনগণকে অবশ্যই বৃহৎ-শক্তি উগ্র-জাতীয়তাবাদের হাত থেকে দৃঢ়ভাবে, নিঃশেষে, পুরোপুরি ও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হবে।

"ডাক্তার সান ইয়াৎ-সেনের স্মরণে"
(নভেম্বর, ১৯৫৬)

আমাদের কোনো ক্রমেই বৃহৎ-শক্তির উগ্র-জাতীয়তাবাদের দাম্ভিক মনোভাব রাখা উচিত নয়, বিপ্লবে জয়লাভ ও দেশ গঠন কার্যে কিছু কিছু সাফল্য অর্জনের কারণে অহঙ্কার ও আত্মগর্ব করা কোনো মতেই উচিত নয়। ছোট হোক আর বড় হোক প্রত্যেকটি দেশের যেমন সদগুণ আছে তেমনি অসদগুণও আছে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

১৯. বিপ্লবী বীরত্ব

এই সৈন্যবাহিনীর আছে অদম্য মনোবল; সমস্ত শত্রুকে পরাভূত করতে এই বাহিনী দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ; এই বাহিনী কোনো মতেই শত্রুর কাছে নতি স্বীকার করবে না। বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট যতই হোক না কেন, একজন মাত্র লোক অবশিষ্ট থাকলেও সে লড়াই করে যাবে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

আমাদের রণশৈলীকে পুরোপুরি কার্যকরী করুন; তা হ'লো : বীরত্বপূর্ণভাবে যুদ্ধ করা, আত্মবলিদানের ভয় না করা, ক্লান্তি ভয় না করা ও ক্রমাগত লড়াই

করা (অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম বিশ্রাম না নিয়ে একটানা কয়েকটা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া)।

"বর্তমান পরিস্থিতি ও আমাদের কর্তব্য" (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭)

আমাদের সামনে হাজার হাজার শহীদ বীরত্বের সঙ্গে জনগণের স্বার্থে প্রাণ বলি দিয়েছেন। আসুন, তাঁদের সেই পতাকা আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি, এবং এগিয়ে চলি তাঁদের রক্ত-রাঙা পথ ধ'রে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

বিজয় অর্জনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হোন, আত্ম-বলিদানে নির্ভয় হোন, সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করুন।

"বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন" (১১ই জুন, ১৯৪৫)

...... উত্তর-অভিযানের অগ্রগতির এক সংকটময় মুহূর্তে, কুওমিনতাঙ কর্তৃপক্ষের বিশ্বাসঘাতী, গণবিরোধী ''পার্টি শুদ্ধি'' নীতি এবং গণ-হত্যার নীতি কুওমিনতাঙ, কমিউনিস্ট পার্টি ও বিভিন্ন স্তরের জনগণের জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্ট—যে যুক্ত ফ্রণ্ট চীনা জনগণের মুক্তির স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করছিল, —সেই যুক্তফ্রণ্টের ও তার সকল বিপ্লবী নীতির সর্বনাশ করলো। ...... এর পরে, ঐক্যের জায়গায় এলো গৃহযুদ্ধ, গণতন্ত্রের স্থলে এলো স্বৈরচারী একনায়কত্ব আর যে চীন ছিল দীপ্তিময় তার স্থানে নেমে এল অন্ধকারাচ্ছন্ন চীন। কিন্তু এটা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা জনগণকে সন্ত্রস্ত করতে পারে নি, বশে আনতে পারে নি কিম্বা নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। তাঁরা ভূপতিত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেন, শরীরের রক্ত চিহ্ন মুছে ফেললেন, নিহত কমরেডদের সমাধিস্থ করলেন এবং আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন সংগ্রামে। বিপ্লবের মহান পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধ'রে সশস্ত্র প্রতিরোধে জেগে উঠলেন তাঁরা, আর চীনের সুবিস্তীর্ণ

অঞ্চল জুড়ে প্রতিষ্ঠা করলেন জনগণের সরকার, ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার করলেন, গ'ড়ে তুললেন একটা গণ-ফৌজ—চীনা লাল ফৌজ, আর সংরক্ষিত ও প্রসারিত করলেন চীনা জনগণের বিপ্লবী শক্তিকে।

''সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে'' (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

আপনাদের বহু সদগুণ আছে এবং বিরাট অবদান আছে, কিন্তু সবসময় মনে রাখবেন যেন আত্মাভিমানী না হয়ে ওঠেন। সবাই আপনাদের সম্মান করেন — ঠিকই করেন, কিন্তু এটা আপনাদেরকে সহজেই অহঙ্কারী করে তোলে। আপনারা যদি অহঙ্কারী হয়ে উঠেন, যদি বিনয়ী না হন, আর সচেষ্ট না থাকেন এবং অন্যদের সম্মান না করেন, কেডারদের ও জনসাধারণকে সম্মান না করেন, তা'হলে আপনারা আর বীর ও আদর্শস্থানীয় থাকতে পারবেন না। অতীতে কিছু লোক এরকম ছিল;

আশা করি, আপনারা তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না।

"অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৫)

শত্রুকে ধ্বংস করার এবং শিল্প ও কৃষি উৎপাদনের পুনরুদ্ধার ও বিকাশ সাধনের সংগ্রামে আপনারা বহু বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করেছেন, প্রভূত সাহস, বুদ্ধি ও উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছেন। গোটা চীনা জাতির সামনে আপনারা হলেন আদর্শ, সর্বক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে নেবার কাজে আপনারাই হলেন মেরুদণ্ড, গণ-সরকারের আপনারাই হলেন নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ, আর আপনারাই হলেন গণ-সরকার ও ব্যাপক জন-সাধারণের মধ্যে সংযোগকারী সেতু।

নিখিল চীনের রণবীর ও আদর্শ-শ্রমজীবী-দের প্রতিনিধি সভায় চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রদত্ত অভিনন্দন বাণী (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫০)

শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে নিজেদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার মনোবল, আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে হারানো ভূমি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দৃঢ়-সংকল্প এবং দুনিয়ার সকল জাতির মাঝে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার ক্ষমতা আমাদের চীনা জাতির আছে।

"জাপান-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণকৌশল সম্পর্কে" (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

২০. অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন

আমাদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমস্ত কেডার ও জনগণ সর্বদাই যেন স্মরণ রাখেন, আমাদের দেশ একটা বিরাট সমাজতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু তা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র; এটা একটা বিরাট দ্বন্দ্ব। আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য কয়েক দশকের কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন; এর মধ্যে রয়েছে কঠোর মিতব্যয়ের প্রয়াস এবং অপচয়ের বিরোধিতা করার প্রয়াস, এর মানে হলো অধ্যবসায়

ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে দেশ গঠন করার নীতি অনুসরণ করা।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

কারখানা ও দোকান, সমস্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, সমবায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে; সকল ব্যাপারেই অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করা উচিত। এটাই মিতব্যয়ের নীতি, মিতব্যয় হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অন্যতম মৌলিক নীতি। চীন হচ্ছে একটা বিরাট দেশ, কিন্তু তা এখনো খুব দরিদ্র। চীনকে সমৃদ্ধিশালী করতে কয়েক দশক লাগবে। কয়েক দশক পরেও অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন হবে; কিন্তু আগামী কয়েক দশক ধ'রে, বর্তমানের পাঁচসালা পরিকল্পনাসমূহের সময়ে, অধ্যবসায় ও

মিতব্যয়িতার স্বপক্ষে বিশেষ ক'রে প্রচার করা এবং মিতব্যয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার।

"অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সমবায় সমিতির চালনা"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

যে কোনো স্থানেই হোক না কেন, জনশক্তি ও বস্তু-সম্পদকে খুব কদর করতে হবে। অদূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া এবং অপব্যয় ও অপচয়ের প্রশ্রয় দেওয়া কোনো ক্রমেই চলবে না। যে কোনো স্থানেই আমরা থাকি না কেন, কার্যারম্ভের প্রথম বছর থেকেই ধরে নিতে হবে যে কাজটা ভবিষ্যতে বহু বছর ধ'রে চলবে, দীর্ঘকাল ধরে আমাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, পাল্টা-আক্রমণ চালাতে হবে এবং শত্রুকে বিতাড়িত করার পর গঠন কাজ চালিয়ে যেতে হবে। একদিকে কোনো মতেই অপব্যয়ী ও অপচয়ী হওয়া চলবে না, অপরদিকে সক্রিয়ভাবে উৎপাদন বাড়াতে হবে। অতীতে কোনো কোনো জায়গায় লোকজন দূরদৃষ্টি গ্রহণ

করেন নি, জনশক্তি ও বস্তু-সম্পদের মিতব্যয়ে মনোযোগ দেন নি, উৎপাদনের সম্প্রসারণে অবহেলা করেছেন, ফলে সেসব জায়গায় লোকদের বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। এই শিক্ষার দিকে এখন অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে।

"অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৫)

কৃষি উৎপাদন ও ছোট ছোট শহরে শিল্প উৎপাদনের দ্রুত পুনরুদ্ধার ও বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ সাধন করার সংগ্রাম চলাকালে উৎপাদনের সব উপযোগী উপকরণ এবং জীবিকার সমস্ত উপযোগী উপায়কে সর্বাধিক পরিমাণে সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে; আর, কোনো লোক তা নষ্ট করলে বা তার অপচয় করলে তার বিরুদ্ধে

এবং বেপরোয়া পান-ভোজের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; মিতব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

"শানসী-স্থইইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১লা এপ্রিল, ১৯৪৮)

সরকারের আর্থিক খরচের ব্যাপারে মিতব্যয়ের নীতি অনুসরণ করা উচিত। সমস্ত সরকারী কর্মীদের কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে হবে যে, দুর্নীতি ও অপচয় অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। দুর্নীতি ও অপচয়বিরোধী সংগ্রামে ইতিমধ্যেই কিছু ফল পাওয়া গেছে, তবে আরো চেষ্টা করা প্রয়োজন। যুদ্ধের জন্য, বিপ্লবী স্বার্থের প্রয়োজনে এবং আমাদের অর্থনৈতিক গঠন কার্যের জন্য প্রতিটি পয়সা বাঁচানোই হচ্ছে আমাদের হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার অবশ্যপালনীয় নীতি।

"আমাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতি" (২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)

জনসাধারণের সঙ্গে একত্রে সুখদুঃখের ভাগ নেবার অনিচ্ছা এবং ব্যক্তিগত খ্যাতি ও লাভের জন্য মাথা ঘামানোর একটা বিপজ্জনক ঝোঁক সম্প্রতি আমাদের কর্মীদের অনেকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এটা খুবই খারাপ। এই ঝোঁক দূর করার একটা উপায় হলো উৎপাদন বৃদ্ধি ও মিতব্যয়ের আন্দোলন চালানোর সময়ে আমাদের সংস্থাগুলোকে সহজতর করে তোলা এবং কেডারদেরকে নিম্নতর স্তরে প্রেরণ করা যাতে বেশ কিছু সংখ্যক কেডার উৎপাদন কাজে ফিরে যেতে পারেন।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

নিজেদের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন করার ফলে সৈন্যবাহিনীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে এবং তা জনগণের বোঝা হাল্কা করেছে; এইভাবে সৈন্যবাহিনীকে আরো সম্প্রসারিত করা সম্ভব

হয়েছে। তাছাড়া এর ফলে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক ফলও পাওয়া গেছে। সেগুলো হচ্ছে :

(১) অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি। অফিসার ও সৈনিকরা এক সঙ্গে উৎপাদনের জন্য কাজ করেন এবং তাঁরা আপন ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছেন।

(২) শ্রমের প্রতি মনোভাবের আরো উন্নতি। ...... নিজেদের ভরণপোষণের জন্য উৎপাদন শুরু করার পর থেকে শ্রমের প্রতি মনোভাবের উন্নতি হয়েছে এবং ভবঘুরে অকর্মণ্যতা দূর হয়েছে।

(৩) দৃঢ়তর শৃংখলা। উৎপাদনের কাজে শ্রম-শৃংখলা অনুসরণ যুদ্ধের শৃংখলা ও সৈনিক জীবনের শৃংখলাকে শিথিল করে নি বরং এগুলোকে দৃঢ়তর করেছে।

(৪) সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের উন্নতি। সৈন্যবাহিনীর নিজের গৃহস্থালি থাকলে জনসাধারণের সম্পত্তির উপরে অবৈধ হস্তক্ষেপ কদাচিৎ ঘটে অথবা আদৌ ঘটে না। উৎপাদনের কাজে সৈন্যবাহিনী ও জনগণ শ্রম-বিনিময় ক'রে পরস্পরকে সাহায্য করেন ব'লে তাঁদের মধ্যকার মৈত্রী সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়।

(৫) সৈন্যবাহিনীতে সরকারের উপর অসন্তোষ কমে গেছে এবং দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ভাল হয়েছে।

(৬) জনগণের মহান উৎপাদন-আন্দোলনের প্রেরণা। সৈন্যবাহিনী একবার উৎপাদনে লেগে গেলে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনগুলিতে উৎপাদনের কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং সেগুলো আরো বেশী সক্রিয়ভাবে কাজ করে; সমগ্র জনগণের সর্বজনীন উৎপাদন-বৃদ্ধির আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতঃই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে, এবং এটাকেও আরো বেশী উদ্যমের সঙ্গে চালিয়ে নেওয়া হয়।

"নিজেদের ভরণপোষণের জন্য সৈন্যবাহিনী কর্তৃক উৎপাদন করা সম্পর্কে এবং শুদ্ধিকরণ ও উৎপাদনের দু'টি মহান আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে"
(২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

কেউ কেউ বলেন, সৈন্যবাহিনী উৎপাদনের কাজে যোগ দিলে সে যুদ্ধ করতে ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে না, এবং সরকার ও অন্যান্য সংগঠনগুলো যদি তা করে তাহ'লে তারাও নিজস্ব কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়বে। এ কথা ভুল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্ত এলাকার সৈন্য-বাহিনী বিরাট আকারে উৎপাদনের কাজ হাতে নিয়ে নিজেদের খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ যথেষ্ট পরিমাণে যোগাড় করেছিল, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রশিক্ষণ এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পড়াশুনা চালিয়েছিল—এসব আগের চেয়ে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছে ; সৈন্যবাহিনীর ভেতরকার এবং সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যকার ঐক্যও আগের চেয়ে দৃঢ়তর হয়েছে। ফ্রণ্ট এলাকায় গত বছর বিরাটাকারের উৎপাদন আন্দোলন চালানো হয়েছিল, আর গত বছর সেখানে যুদ্ধেও বিরাট সাফল্য অর্জিত হয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে সৈন্যদের প্রশিক্ষণ আন্দোলন শুরু করা হয়েছিল। উৎপাদনের কারণে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনগুলিতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জীবনের মান আরো উন্নত হয়েছে, এবং আরো একাগ্র মনে, আরো যোগ্যতার সঙ্গে তাঁরা কাজ করেছেন। ফ্রণ্ট ও সীমান্ত এলাকা উভয় স্থানেই এই অবস্থা।

"অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৫)

২১. আত্মনির্ভরতা ও কঠোর সংগ্রাম

আমাদের কর্মনীতি কোন ভিত্তির উপরে স্থাপিত হওয়া উচিত? নিজেদের শক্তির ভিত্তির উপর। এটাকেই আত্মনির্ভরতা বলা হয়। আমরা একা নই, দুনিয়ার সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দেশ ও জনগণই হচ্ছে আমাদের বন্ধু। তথাপি আমরা আত্মনির্ভরতার উপরেই জোর দিই। আমরা নিজেরা যে শক্তি গ'ড়ে তুলি তার উপর নির্ভর ক'রে আমরা সমস্ত চীনা ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাজিত করতে পারি।

"জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে বিজয়ের পরের পরিস্থিতি ও আমাদের কর্মনীতি" (১৩ই আগষ্ট, ১৯৪৫)

আমরা আত্মনির্ভরতার পক্ষে। আমরা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করি, কিন্তু তার উপর আমরা নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারি নে; আমরা নিজেদের প্রচেষ্টার উপর এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও জনগণের সৃজনী শক্তির উপরেই নির্ভর করে থাকি।

"অর্থনৈতিক কার্য চালনা শিখে নিতে হবে" (১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৫)

দেশব্যাপী বিজয় লাভ করাটা হচ্ছে দশ হাজার লি দীর্ঘ অভিযানের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।...... চীনা বিপ্লব মহান, কিন্তু বিপ্লবের পরের পথ হবে দীর্ঘতর, কাজটা হবে আরো মহান এবং আরো দুরূহ। পার্টিতে এ কথাটা এখনি অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দিতে হবে। কমরেডরা যাতে তাঁদের কাজে বিনয়ী ও সতর্ক হবার রীতিতে এবং অহং-কার ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত থাকার রীতিতে অবিচল থাকেন সে ব্যাপারে তাঁদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে। সাদাসিদে জীবন যাপন ও

কঠোর সংগ্রামের রীতিকে যাতে কমরেডরা বজায় রেখে চলেন সে ব্যাপারেও তাঁদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতে হবে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

কঠোর সংগ্রাম না করে, ঘর্ম ও রক্তপাত না ঘটিয়ে সৌভাগ্যবশতঃ সহজে বিজয় লাভের যে সমস্ত ধারণা আমাদের কেডারদের মধ্যে রয়েছে সেসব অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

"উত্তর-পূর্বে সুদৃঢ় ঘাঁটি এলাকা গড়ে তুলুন" (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫)

আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্ব-অগ্রগতির অবস্থা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সর্বদা প্রচার চালাতে হবে যাতে বিজয়ের উপর জনগণ আস্থা স্থাপন করতে পারেন। একই সময়ে জনগণ এবং কমরেডদেরকে আমাদের বলে দিতে হবে যে এই পথ আঁকাবাঁকা। বিপ্লবের পথে আরো অনেক বাধাবিঘ্ন ও দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। আমাদের পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে ধ'রে নেওয়া হয়েছিল যে, আমাদের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, কারণ বাধা-বিপত্তি কম না হয়ে আরো বেশি হবে এটা ধ'রে নিতে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম। আমাদের কোনো কোনো কমরেড কষ্টের কথা বেশী করে ভাবতে চান না। কিন্তু কষ্টটা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা, যত কষ্টই থাক সবগুলিকে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে, "অস্বীকারের নীতি" অবলম্বন করলে চলবে না। আমাদের কষ্টকে স্বীকার করতে হবে, তার বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। পৃথিবীতে কোথাও সোজা পথ নেই, আঁকাবাঁকা পথে চলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, কখনো সস্তায় কোনো কিছু লাভের চেষ্টা করা আমাদের চলবে না। এমন মনে করা কিছুতেই চলবে না যে, কোনো এক সুন্দর প্রভাতে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বেচ্ছায় হাঁটু গেড়ে নত হয়ে বসে পড়বে। এক কথায়,

আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তবে পথটা আঁকাবাঁকা। আমাদের সামনে এখনো বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে, সেগুলি আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না। সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা নিশ্চয়ই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে ও বিজয় অর্জন করতে পারি।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে"
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

যাঁরা শুধুমাত্র উজ্জ্বল দিকটা দেখেন, কষ্টের দিকটা দেখেন না তাঁরা পার্টির কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংগ্রাম করতে পারেন না।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরাই সমাজের সম্পদ সৃষ্টি করেন। যদি তাঁরা নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে তুলে নেন, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী লাইন অনুসরণ করেন, সমস্যা এড়িয়ে না গিয়ে তার

সমাধান করার জন্য সক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করেন, তাহ'লে পৃথিবীতে এমন কোনো বাধাবিঘ্ন থাকবে না যা তাঁরা অতিক্রম করতে পারবেন না।

"পার্টি-সম্পাদক সর্বাগ্রে কাজে হাত লাগান, সমগ্র পার্টি সমবায়সমিতি গঠনের কাজ করে"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

গোটা পার্টির কমরেডদের অবশ্যই এ সব কিছু পরিপূর্ণভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং অদম্য মনোবলের সঙ্গে পরিকল্পিতভাবে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও আমাদের উভয়ের সামনেই বাধা-বিপত্তি রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির পক্ষে বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা অসম্ভব, কারণ তারা মৃতপ্রায়, তাদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আমাদের বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করা যেতে পারে, কারণ আমরা নতুন ও উদীয়মান শক্তি, আর আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

"চীনা বিপ্লবের নতুন উত্তাল জোয়ারকে স্বাগত জানান" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭)

কষ্টের সময়ে আমাদের সাফল্যের কথা ভুললে চলবে না, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং সাহস অবলম্বন করতে হবে।

"জনগণের সেবা কর" (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

যে কোনো নতুন জিনিসকে বিকাশের সময়ে সর্বদাই বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এঁকে-বেঁকে চলতে হয়। বাধা-বিপত্তি ছাড়া ও ব্যাহত না হয়ে এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের কাজ সহজে তরতর করে এগিয়ে যাবে এমন চিন্তা করা নেহাৎ কল্পনা বিলাস মাত্র।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

বিপ্লবী সংগ্রামে কোনো কোনো সময়ে অনুকূল অবস্থার তুলনায় প্রতিকূল অবস্থাই বেশী জোরদার হয়ে উঠে; এই সময়ে প্রতিকূল অবস্থা হচ্ছে দ্বন্দ্বের প্রধান দিক, অনুকূল অবস্থা হচ্ছে গৌণ দিক। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রয়াসের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থাকে ধাপে ধাপে অতিক্রম করা সম্ভব, নতুন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাও সম্ভব; এমনি করে প্রতিকূল অবস্থার স্থলে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

কাজ কাকে বলে? কাজ হচ্ছে সংগ্রাম। ঐ সব স্থানে রয়েছে বাধা-বিপত্তি যেগুলিকে আমাদের অতিক্রম করতে হবে, আর রয়েছে সমস্যা যে-গুলি সমাধান আমাদের করতে হবে। এই সব বাধা-বিপত্তিগুলি অতিক্রম করার জন্যই সেখানে আমরা কাজ করতে ও সংগ্রাম করতে যাই। যেখানে যত বেশী বাধা-বিপত্তি সেখানে যেতে তত বেশী আগ্রহশীল এমন কমরেডই একজন ভাল কমরেড।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

একটা প্রাচীন চীনা উপকথা আছে, তা হ'ল ''বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন''। এ উপকথায় প্রাচীন কালের এক বুড়োর কাহিনী বলা হয়েছে। তিনি বাস করতেন উত্তর চীনে। উত্তর পাহাড়ের বোকা বুড়ো নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর বাড়িটার দক্ষিণে ছিল দু'টি উঁচু পাহাড়, একটার নাম থাইহাং, অন্যটার নাম ওয়াংউ। এই দু'টি পাহাড় তাঁর বাইরে যাবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে ছিল। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে এই পাহাড় দু'টিকে কোদাল দিয়ে খুঁড়ে সরিয়ে ফেলবার জন্য তাঁর ছেলেদের নিয়ে গেলেন। বিজ্ঞ বুড়ো নামে পরিচিত অপর একজন পাকা দাড়ি বিশিষ্ট লোক তাদের দেখে উপহাস করে বললেন, ''তোমরা কি বোকার মতোই না কাজ করছো। এই বিরাট পাহাড় দু'টোকে খুঁড়ে সরিয়ে ফেলা তোমাদের পিতাপুত্র ক'জনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।'' বোকা বুড়ো জবাব দিলেন, ''আমি মরে গেলে আমার ছেলেরা এ কাজ চালিয়ে যাবে; তারা যখন মারা যাবে তখন কাজ চালাবে আমার নাতিরা; আর তার পরে চালাবে

তাদের ছেলেরা ও নাতিরা। এমনি চলবে অনন্ত কাল ধরে। পাহাড় দু'টি অনেক উঁচু, কিন্তু এগুলি আর উঁচু হতে পারবে না। আমরা যতটুকু খুঁড়ে ফেলব, ততটুকুই এগুলি নীচু হবে। তা'হলে কেন আমরা তাদের খুঁড়ে সমান করতে পারবো না?'' বিজ্ঞ বুড়োর ভুল অভিমতটা খণ্ডন করে তিনি অবিচল বিশ্বাসের সাথে প্রতিদিন খুঁড়তে থাকলেন। এই দেখে ভগবান মুগ্ধ হলেন, তিনি দু'জন দেবদূতকে পৃথিবীতে অবতরণ করালেন। তাঁরা এসে পাহাড় দু'টিকে পিঠে করে নিয়ে চলে গেলেন। আজ চীনা জনগণের মাথার উপরেও দু'টো প্রকাণ্ড পাহাড় চেপে ব'সে আছে। একটা হচ্ছে সাম্রাজ্য-বাদ, আর অন্যটা সামন্ততন্ত্র। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি এ দু'টোকে খুঁড়ে উপড়ে ফেলবার জন্য অনেক দিন আগেই মনস্থির করেছে। আমাদের অবশ্যই অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং কাজ করতে হবে বিরাম-হীনভাবে; আমরাও তখন ভগবানের মন গলাতে পারবো। আমাদের ভগবান কিন্তু চীনা জনসাধারণ ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা যদি একযোগে উঠে

দাঁড়ান এবং আমাদের সঙ্গে মিলে খুঁড়তে থাকেন, তা'হলে এই দু'টো পাহাড়কে উপড়ে ফেলা যাবে না কেন?

"বোকা বুড়ো পাহাড় সরিয়েছিলেন"
(১১ই জুন, ১৯৪৫)

২২. চিন্তাধারার পদ্ধতি ও কাজের পদ্ধতি

মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে বাধ্যবাধকতার রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে অবিরাম বিকাশ লাভের একটা ইতিহাস। এই প্রক্রিয়া কখনো শেষ হবে না। যে সমাজে শ্রেণী বিদ্যমান সেখানে শ্রেণী সংগ্রাম শেষ হবে না। শ্রেণীহীন সমাজে নূতন ও পুরাতনের, নির্ভুল ও ভুলের মধ্যকার সংগ্রাম কোনো দিনই শেষ হবে না। উৎপাদন সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানবজাতি অবিরাম বিকাশ লাভ করে, আর প্রকৃতিও নিরন্তর পরিবর্তিত হয়; এই প্রক্রিয়া কখনো একই স্তরে

নিশ্চল হয়ে থাকে না। অতএব, মানবজাতিকে অবিরামভাবে অভিজ্ঞতার সারসংকলন করতে হয়, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করতে হয়, সৃষ্টি ও অগ্রগতি সাধন করতে হয়। নিশ্চলতা, হতাশা, নিষ্ক্রিয়তা এবং অহঙ্কার ও আত্মতৃপ্তির দৃষ্টিকোণ সবই ভুল। এগুলি ভুল, কারণ প্রায় দশ লক্ষ বছর ধ'রে মানবজাতির সামাজিক বিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে এগুলি সঙ্গতিশীল নয়, এবং সঙ্গতিশীল নয় অদ্যাবধি আমাদের জানা প্রকৃতির (অর্থাৎ আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, জীবজগৎ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিষয়ের ইতিহাসে যে প্রকৃতি আমাদের কাছে প্রকাশিত সেই প্রকৃতির) ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে।

"চীন গণ প্রজাতন্ত্রের তৃতীয় জাতীয় গণ-কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাইয়ের প্রদত্ত সরকারী কাজকর্ম সম্পর্কিত রিপোর্ট" থেকে উদ্ধৃত (২১-২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৪)

প্রকৃতি-বিজ্ঞান হচ্ছে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে মানুষের একটা অস্ত্র। সমাজে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই সমাজ-বিজ্ঞানের দ্বারা সমাজকে বুঝতে হবে, সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে এবং সমাজ-বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে। প্রকৃতি-জগতে স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে অবশ্যই প্রকৃতি-বিজ্ঞান ব্যবহার করে প্রকৃতিকে জানতে হবে, তাকে বশে আনতে হবে ও তার রূপান্তর সাধন করতে হবে, এবং এমনি করেই প্রকৃতির বাধ্যবাধকতা থেকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

সীমান্ত এলাকার প্রকৃতি-বিজ্ঞান গবেষণা সোসাইটির উদ্বোধনী সভায় প্রদত্ত ভাষণ (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০)

মার্কসবাদী দর্শন—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দু'টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে: একটা হচ্ছে তার শ্রেণী প্রকৃতি; এটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সর্বহারাশ্রেণীর সেবায় নিয়োজিত।

অপরটা হচ্ছে এর বাস্তব প্রকৃতি; এতে গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, তত্ত্ব অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল, তত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে অনুশীলন, আবার তত্ত্ব অনুশীলনের সেবা করে।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

মার্কসবাদী দর্শনের মতানুসারে বাস্তব জগতের বিধি-নিয়ম বোঝা এবং এইভাবে তাকে ব্যাখ্যা করতে পারাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয়, বরং তাহ'ল বাস্তব বিধি-নিয়মের জ্ঞানের দ্বারা জগৎকে সক্রিয়ভাবে বদলে দেওয়া।

ঐ

মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে? সেগুলো কি আকাশ থেকে পড়ে?—না। সেগুলো কি নিজের মনের মধ্যে সহজাত?—তা নয়। মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কেবলমাত্র সামাজিক অনুশীলন থেকেই আসে; সমাজের উৎপাদন সংগ্রাম, শ্রেণী-

সংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা—এই তিনটি অনুশীলন থেকেই সেগুলো আসে।

"মানুষের নির্ভুল চিন্তাধারা কোথা থেকে আসে?" (মে, ১৯৬৩)

মানুষের সামাজিক সত্তা তার চিন্তাধারাকে নির্ধারণ করে। অগ্রগামী শ্রেণীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমূলক নির্ভুল চিন্তাধারাকে জনসাধারণ একবার আয়ত্ত করে নিতে পারলেই এই চিন্তাধারা বস্তুগত শক্তিতে পরিণত হয়, যা সমাজকে পুনর্গঠন করে এবং দুনিয়াকে রূপান্তরিত করে।

ঐ

মানুষ তাদের সামাজিক অনুশীলনে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং প্রভূত অভিজ্ঞতা অর্জন করে—সফলতার অভিজ্ঞতা এবং বিফলতার অভিজ্ঞতা উভয়ই। বাস্তবমুখী বহির্জগতের অসংখ্য ঘটনা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের মাধ্যমে তার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত

হয়। প্রারম্ভে জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান। যখন এই ধরনের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয় তখন একটা দ্রুত-অতিক্রমণ ঘটে আর তা ধারণাত্মক জ্ঞানে পরিবর্তিত হয়—এটাই হচ্ছে চিন্তাধারা। এটা হচ্ছে জ্ঞানের একটা প্রক্রিয়া। এটাই হচ্ছে জ্ঞানের গোটা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ বাস্তব পদার্থ থেকে আত্মমুখী চেতনায়, সত্তা থেকে চিন্তাধারায় চালিত হবার পর্যায়। এই পর্যায়ে চেতনা বা চিন্তাধারা (তত্ত্ব, নীতি, পরিকল্পনা ও পদ্ধতিসহ) বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মগুলোকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে কি না তা এখনো প্রমাণিত হয় নি, সেগুলো নির্ভুল বা ভুল তা নির্ধারণ করা এখনো সম্ভব নয়। তারপর আসে জ্ঞানের প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়, অর্থাৎ চেতনা থেকে বস্তুতে, চিন্তাধারা থেকে সত্তায় চালিত হবার পর্যায়; এই পর্যায়ে, প্রথম পর্যায়ের অর্জিত জ্ঞানকে সামাজিক অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয় এবং তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা, পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে কি না তা নির্ণয় করা যায়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যা সফল হয় তা নির্ভুল, আর যা ব্যর্থ হয় তা ভুল; বিশেষ করে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে এটা সত্য। সামাজিক সংগ্রামে অগ্রগামী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী শক্তিগুলো কখনো কখনো পরাজিত হয়; তাদের পরাজয়ের কারণ এ নয় যে তাদের চিন্তাধারা ভুল, বরং তার কারণ এই যে সংগ্রামরত শক্তিগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো যতটা শক্তিশালী, অগ্রগামী শক্তিগুলো আপাততঃ ততটা শক্তিশালী নয়; তাই তারা সাময়িকভাবে পরাজিত হয়, কিন্তু একদিন না একদিন তারা জয়ী হতে বাধ্য। অনুশীলনের পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানের আর একটা দ্রুত-অতিক্রমণ ঘটে। এই দ্রুত-অতিক্রমণের গুরুত্ব পূর্বেরটির চেয়ে বেশী। কারণ, কেবলমাত্র এই দ্রুত-অতিক্রমণই জ্ঞানের প্রথম দ্রুত-অতিক্রমণের ভুল অথবা নির্ভুলতাকে, অর্থাৎ বাস্তবমুখী বহির্জগ-তের প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় অর্জিত চিন্তাধারা, তত্ত্ব, কর্মনীতি, পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ইত্যাদির ভুল

অথবা নির্ভুলতাকে—প্রমাণ করতে পারে। সত্যকে যাচাই করার এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ঐ

একটা নির্ভুল জ্ঞান প্রায়শঃই বস্তু থেকে চেতনায় এবং চেতনা থেকে বস্তুতে, অর্থাৎ অনুশীলন থেকে জ্ঞানে এবং জ্ঞান থেকে অনুশীলনে অনেকবার পুনরাবৃত্তির পরেই কেবল আয়ত্ত করা যায়। এটাই হচ্ছে মার্কসবাদের জ্ঞানতত্ত্ব, অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের জ্ঞানতত্ত্ব।

ঐ

কেউ কোনো বস্তুকে জানতে চাইলে তার সংস্পর্শে আসা, অর্থাৎ সে বস্তুর পরিবেশে বাস করা (অনুশীলন করা) ছাড়া সে ব্যক্তির আর কোনো উপায় নেই। ...... যদি আপনি জ্ঞানার্জন করতে চান তা'হলে বাস্তব জগৎকে পরিবর্তন করার অনুশীলনে আপনাকে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে হবে। যদি আপনি নাশপাতির স্বাদ জানতে চান

তা'হলে আপনাকে অবশ্যই নাশপাতির পরিবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ নিজের মুখে খেতে হবে। ...... যদি আপনি বিপ্লবের তত্ত্ব ও পদ্ধতি জানতে চান তা'হলে আপনাকে অবশ্যই বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হচ্ছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

অনুশীলন থেকে জ্ঞানের শুরু হয়, এবং অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে আবার অবশ্যই অনুশীলনে ফিরে আসতে হবে। জ্ঞানের সক্রিয় ভূমিকা কেবলমাত্র যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান থেকে ধারণাত্মক জ্ঞানে সক্রিয়ভাবে দ্রুত-অতিক্রমণের মধ্যে ব্যক্ত হয় তাই নয়, বরং আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ধারণাত্মক জ্ঞান থেকে বিপ্লবী অনুশীলনে দ্রুত-অতিক্রমণের মধ্যেও তা অভিব্যক্ত হয়।

ঐ

এটা সুবিদিত যে, যে কোনো কাজই করি না কেন, যদি তার প্রকৃত অবস্থা, প্রকৃতি ও অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে তার সম্পর্কাদি না বুঝি, তা'হলে সে কাজের নিয়ম জানবো না, কেমন করে তা সম্পন্ন করতে হয় তা জানবো না, তাকে ভাল করে সম্পন্ন করতেও পারবো না।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

যদি কোনো মানুষ কাজে সাফল্য লাভ করতে চায় অর্থাৎ প্রত্যাশিত ফল পেতে চায়, তা'হলে তার নিজের চিন্তাকে অবশ্যই বাস্তবমুখী বহির্জগতের নিয়মের অনুরূপ করে তুলতে হবে; যদি তা অনুরূপ না হয় তা'হলে সে অনুশীলনে ব্যর্থ হবে। ব্যর্থ হয়েই মানুষ তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজের চিন্তাকে সংশোধন ক'রে বহির্জগতের নিয়মের অনুরূপ করে তোলে; তখন মানুষ তার বিফলতাকে সফলতায় পরিবর্তিত করতে পারে; "বিফলতাই সফলতার জননী" এবং "ঠেকে শেখা" বলতে এটাই বুঝায়।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

আমরা মার্কসবাদী; মার্কসবাদ আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, কোনো সমস্যার বিচার করতে গেলে, বিমূর্ত সংজ্ঞা থেকে নয়, বরং বাস্তবে বিদ্যমান তথ্য থেকে শুরু করতে হবে, এবং এই সব তথ্যের বিশ্লেষণ থেকেই পথনির্দেশক নীতি, কর্মনীতি এবং উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

"সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

বাস্তব অবস্থা অনুসারে কর্মনীতি নির্ধারণ করাটা হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক কর্মপদ্ধতি, যা সমস্ত কমিউনিস্টদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে। আমরা যে ভুল করেছি তার উৎপত্তির কারণ অনু-সন্ধান করতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে,

আমরা নির্দিষ্ট স্থান ও কালের বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম এবং আত্মগতভাবে নিজেদের কর্মনীতি নির্ধারণ করেছিলাম।

"শানসী-সুইইউয়ান মুক্ত এলাকার কেডার সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১লা এপ্রিল, ১৯৪৮)

দুনিয়ায় ভাববাদ ও অধিবিদ্যাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ জিনিস, কারণ এতে মানুষ যত খুশী আবোল-তাবোল বকতে পারে, তাদের কথাবার্তাকে বাস্তব-মুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হয় না এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায় তাকে পরীক্ষিতও হতে হয় না। অপরপক্ষে, বস্তুবাদ ও দ্বন্দ্ববাদের জন্য দরকার প্রয়াসের; সেগুলিকে বাস্তবমুখী বাস্তবতার উপর ভিত্তি করতে হবে এবং বাস্তবমুখী বাস্তবতায় পরী-ক্ষিত হতে হবে। এব্যাপারে প্রচেষ্টা না থাকলে যে

কোনো ব্যক্তির পক্ষে ভাববাদ ও অধিবিদ্যার গহ্বরে নিপতিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

"হু ফেং প্রতিবিপ্লবী চক্র সম্পর্কিত তথ্য"
–এর ভূমিকালিপি (মে, ১৯৫৫)

যখন আমরা কোনো বিষয়কে দেখি, তখন অবশ্যই তার অন্তর্বস্তুকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তার বাহ্যরূপটাকে দেখতে হবে শুধুমাত্র প্রবেশ দ্বারের পথপ্রদর্শক হিসেবে; আর প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করলেই সে বিষয়ের অন্তর্বস্তুকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। এটাই হচ্ছে বিশ্লেষণের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

"একটি স্ফুলিঙ্গ বিরাটাকারের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে" (৫ই জানুয়ারী, ১৯৩০)

বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ বাহ্যিক নয়, তাহ'ল আভ্যন্তরীণ; বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যেই এটা নিহিত। যে কোনো বস্তুর ভেতরে এই ধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, সেটাই বস্তুর গতি ও বিকাশ ঘটায়।

বস্তুর ভেতরকার এই ধরনের দ্বন্দ্বই হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের মৌলিক কারণ, অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে কোনো একটা বস্তুর আন্তঃসংযোগ ও আন্তঃক্রিয়া হচ্ছে বস্তুর বিকাশ লাভের গৌণ কারণ।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদের মতে বাহ্যিক কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের শর্ত, আর আভ্যন্তরীণ কারণ হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তি; আভ্যন্তরীণ কারণের মাধ্যমে বাহ্যিক কারণ সক্রিয় হয়। যথাযথ তাপেই মুরগীর ডিম মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত হয়, কিন্তু কোনো তাপই পাথরকে মুরগীর ছানায় পরিবর্তিত করতে পারে না, কারণ এ দুইয়ের ভিত্তি ভিন্ন।

ঐ

মার্কসবাদী দর্শনের মতে বিপরীতের একত্বের নিয়ম হচ্ছে বিশ্বের মৌলিক নিয়ম। প্রাকৃতিক জগতে, মানবসমাজে অথবা মানুষের চিন্তাধারায় সর্বত্রই এই নিয়ম কার্যকরী। দ্বন্দ্বের বিপরীত দিকগুলোর মধ্যে একত্ব ও সংগ্রাম উভয়ই বর্তমান, আর এটাই বস্তুকে দেয় গতি ও পরিবর্তনের প্রেরণা। দ্বন্দ্ব সর্বত্রই থাকে, কিন্তু বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে দ্বন্দ্বসমূহের প্রকৃতিও বিভিন্ন। যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুতে বিপরীতের একত্ব হচ্ছে শর্তসাপেক্ষ, সাময়িক ও উত্তরণ-সাপেক্ষ, সেজন্য আপেক্ষিক; কিন্তু বিপরীতের সংগ্রামটা হলো অনাপেক্ষিক।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি হচ্ছে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি। যাকে বিশ্লেষণ বলা হয়, তা হচ্ছে কোন বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ। জীবন সম্পর্কে গভীর

জ্ঞান এবং প্রাসঙ্গিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে প্রকৃত উপলব্ধি না থাকলে সুষ্ঠু বিশ্লেষণ অসম্ভব।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

লেনিন বলেছেন, বাস্তব অবস্থার বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ হচ্ছে "মার্কসবাদের একান্ত সারবস্তু এবং মার্কসবাদের জীবন্ত আত্মা"। বিশ্লেষণ করার প্রবৃত্তির অভাবে আমাদের বহু কমরেডই জটিল বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে পুনঃপুনঃ বিশ্লেষণ ও গবেষণা করতে চান না; পরন্তু একেবারেই হ্যাঁ অথবা একেবারেই না — এমন সরল সিদ্ধান্ত নিতে পছন্দ করেন। ...... এখন থেকে এ ধরনের অবস্থার প্রতিকার করা আমাদের উচিত।

"অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি" (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪)

এই সব কমরেড যে পদ্ধতিতে সমস্যাগুলো দেখেন তা ঠিক নয়। সমস্যার সারবস্তু বা প্রধান দিকগুলোর উপরে তাঁরা নজর দেন না; পরন্তু তাঁরা জোর দেন অসারবস্তু বা অপ্রধান দিকগুলোর উপরে। এটা দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, এই সব অসারবস্তুর সমস্যা বা অপ্রধান সমস্যাকে অবহেলা করা চলবে না এবং এক একটা করে তাদের সমাধান অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু সেগুলোকে সারবস্তু বা প্রধান দিক হিসেবে ধরা উচিত নয়, অন্যথায় আমরা দিশেহারা হবো।

"কৃষি-সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে" (৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

এই পৃথিবীতে সব বিষয়ই হলো জটিল প্রকৃতির এবং বহু উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত। বিভিন্ন দিক থেকে সমস্যাগুলোকে দেখতে হবে, শুধুমাত্র একটা দিক থেকে দেখলে চলবে না।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে" (১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

যাঁরা আত্মগত, একতরফা এবং ভাসাভাসাভাবে সমস্যাকে দেখেন, শুধু তাঁরাই কোনো জায়গায় আসা মাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা না করে, ব্যাপারটাকে সামগ্রিকভাবে (তার ইতিহাস ও সমগ্র বর্তমান অবস্থাকে) বিবেচনা না করে এবং ব্যাপারের সারাংশকেও (তার প্রকৃতি এবং তার ও অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক) উপলব্ধি না করেই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে হুকুম জারী করতে থাকেন। এ ধরনের লোক হোঁচট খেতে বাধ্য।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

সমস্যার পর্যালোচনার ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই আত্মমুখিতা, একদেশদর্শিতা ও খোলস-সর্বস্বতা ছাড়তে হবে। যাকে আত্মমুখিতা বলে, তাহ'ল সমস্যাকে বাস্তবভাবে না দেখা, অর্থাৎ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে সমস্যাকে না দেখা। আমার "অনুশীলন সম্পর্কে" নিবন্ধে এই বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই বলেছি। একদেশদর্শিতার অর্থ হচ্ছে সমস্যাকে

সব দিক থেকে না দেখা। ...... অথবা বলা যায় যে, শুধু অংশ-বিশেষকে দেখা, সমগ্রকে না দেখা; শুধু বৃক্ষগুলোকেই দেখা, অরণ্যকে না দেখা। এই ভাবে কোনো দ্বন্দ্বের সমাধানের পদ্ধতি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, অসম্ভব বিপ্লবী কর্তব্য সম্পন্ন করা, অসম্ভব অর্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করা, অসম্ভব পার্টির আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত সংগ্রামকে সঠিকভাবে বিকশিত ক'রে তোলা। সামরিক ব্যাপার প্রসঙ্গে সুন জি বলেছিলেন, "শত্রুকে জানুন, আর নিজেকে জানুন; তা'হলে একশ' বার যুদ্ধ করলেও পরাজিত হবেন না।" তিনি এখানে যুদ্ধরত দু'টি পক্ষের উল্লেখ করেছেন। থাং রাজবংশের আমলে ওয়েই চেং যখন বলেছিলেন, "উভয় পক্ষকে শুনলে আপনি জ্ঞানালোক-প্রাপ্ত হবেন, আর একপক্ষকে বিশ্বাস করলে অজ্ঞানতিমিরে ডুববেন,"—তখন তিনিও একদেশদর্শিতার ভুল ধরতে পেরেই একথা বলেছিলেন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা প্রায়শঃই একতরফাভাবে সমস্যাকে দেখে থাকেন, আর তাই প্রায়ই তাঁরা অপ্রত্যাশিত বাধার মধ্যে পড়েন। ......

লেনিন বলেন, "কোনো বস্তুকে সত্যি সত্যি জানার জন্য অবশ্যই তার সব দিক, তার সব সংযোগ ও 'মধ্যস্থতাকে' গভীরভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলির পর্যালোচনা করতে হবে। কোনো দিনই এটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অর্জন করবো না; কিন্তু সর্বতোমুখী বিচার-বিবেচনার দাবি করতে হবে, কারণ এটা আমাদেরকে ভুল ও আড়ষ্টতা থেকে রক্ষা করবে।" তাঁর কথাগুলো আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। খোলসসর্বস্ব হবার অর্থ হলো দ্বন্দ্বের সামগ্রিকতা ও দ্বন্দ্বের বিভিন্ন দিকের বৈশিষ্ট্যগুলোর বিচার না করা, কোনো বস্তুর গভীরে গিয়ে পুংখানুপুংখভাবে দ্বন্দ্বের বৈশিষ্ট্যকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা, শুধু দূর থেকে দেখা এবং স্থূলভাবে দ্বন্দ্বের পরিলেখটি দেখার পর তক্ষণি দ্বন্দ্ব মীমাংসার চেষ্টা করা (প্রশ্নের জবাব, বিতর্কের মীমাংসা, কার্য চালনা অথবা যুদ্ধ পরিচালনা)। এইভাবে কাজ করলে বিভ্রাট ঘটতে বাধ্য। ...... একদেশদর্শিতা ও খোলসসর্বস্বতা হচ্ছে

আত্মমুখিতাও, কারণ সমস্ত বাস্তব জিনিসই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পরস্পর সংযুক্ত এবং আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মের দ্বারা পরিচালিত, কিন্তু এই অবস্থাগুলো যথার্থভাবে প্রতিফলিত করবার দায়িত্ব গ্রহণের বদলে কিছু লোক সেগুলোকে একতরফা ও ভাসাভাসাভাবে দেখেন এবং সেগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ জানেন না, সেগুলোর আভ্যন্তরীণ বিধিনিয়মও বুঝেন না, এবং সেজন্য এ ধরনের পদ্ধতি হচ্ছে আত্মমুখীবাদী পদ্ধতি।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

একদেশদর্শিতার অর্থ হচ্ছে পরম কথার চৌহদ্দির মধ্যে চিন্তা করা, অর্থাৎ, সমস্যার প্রতি একটা আধিবিদ্যক মনোভাব। আমাদের কাজের বিচার করার সময়ে, হয় সমস্তই ইতিবাচক, আর না হয় সমস্তই নেতিবাচক এমন মনে করাটাই হচ্ছে একদেশদর্শিতা। ...... সবকিছুই ইতিবাচক হিসেবে মনে করার অর্থ হলো শুধু ভালটাই দেখা, আর

খারাপটা না দেখা এবং শুধু প্রশংসাকেই সহ্য করা, সমালোচনাকে সহ্য না করা। আমাদের কাজে সবকিছুই ভাল—এমন বলাটা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন। সবকিছুই ভাল এ কথা সত্য নয়, ভুল-ত্রুটিও রয়েছে। কিন্তু আবার এও সত্য নয় যে সবকিছুই খারাপ; এটাও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলে না। এখানে প্রয়োজন বিশ্লেষণের। সবকিছুকে অস্বীকার করার অর্থ হলো কোনো রকম বিশ্লেষণ না করেই একথা চিন্তা করা যে, কোন কিছুই ভা-লোভাবে করা হয় নি এবং সমাজতন্ত্র গ'ড়ে তোলার মহান কাজে—যে মহান সংগ্রামে কোটি কোটি লোক অংশগ্রহণ করছে তা একেবারেই একটা জগাখিচুড়ি এবং তার মধ্যে প্রশংসার যোগ্য কিছুই নেই। এই মত যারা পোষণ করে তাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন লোকদের পার্থক্য থাকলেও এই সব অভিমত খুবই ভুল ও ক্ষতিকর এবং এটা মানুষের মনোবলকে কেবল ভেঙ্গেই দিতে পারে। সবকিছুই ইতিবাচক কিংবা সবকিছুই

নেতিবাচক এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কাজের মূল্যায়ন করাটা ভুল।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

কোনো সমস্যার বিচার করার সময়, মার্কসবাদী-দের শুধু তার অংশ-বিশেষকে দেখলে চলবে না, তার সামগ্রিকতাকেও দেখতে হবে। একটা ব্যাঙ কুয়োর মধ্যে বসে বলে, "আকাশটা কুয়োর মুখের মতো বড়।" এটা সত্য নয়, কারণ আকাশ যে শুধু কুয়োর মুখের মতো বড়, তা নয়। যদি সে বলত, "আকাশের একাংশ কুয়োর মুখের মতো বড়," তা'হলে এটা ঠিক হতো, কারণ এটা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিশীল।

"জাপান-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণকৌশল সম্পর্কে" (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৫)

আমাদের অবশ্যই সমস্যাগুলোকে সবদিক থেকে দেখতে শিখতে হবে, কোনো বস্তুর শুধু সম্মুখটা

দেখতে হবে তা-ই নয়, তার পিছনটাও দেখতে হবে। নির্দিষ্ট অবস্থায়, খারাপ জিনিস ভাল ফল দিতে পারে, আবার ভাল জিনিসও খারাপ ফল দিতে পারে।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমরা স্বীকার করি যে, ইতিহাসের সাধারণ বিকাশে বস্তুগত জিনিস মানসিকতাকে নির্ধারণ করে, সামাজিক সত্তা সামাজিক চেতনাকে নির্ধারণ করে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা বস্তুগত জিনিসের উপর মানসিকতার প্রতিক্রিয়া, সামাজিক সত্তার উপর সামাজিক চেতনার প্রতিক্রিয়া, এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর উপরি-কাঠামোর প্রতিক্রিয়াকে স্বীকার করি—বস্তুতঃ একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। এটা বস্তুবাদকে লংঘন করে না, পক্ষান্তরে যান্ত্রিক বস্তুবাদকে পরিহার করে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তু-বাদকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁরা বাস্তব অবস্থার দ্বারা আরোপিত সীমা লংঘন ক'রে যুদ্ধে জয়লাভের আশা করতে পারেন না, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যে উদ্যোগের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভের চেষ্টা তাঁরা করতে পারেন এবং তা অবশ্যই তাঁদের করতে হবে। যুদ্ধ পরিচালকদের ক্রিয়ামঞ্চকে অবশ্যই বাস্তব অবস্থার সম্ভাবনার উপরে গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু এই মঞ্চের উপর তাঁরা শব্দ, বর্ণ, শক্তি ও আড়ম্বরময় অনেক নাট্যানুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারেন।

"দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ সম্পর্কে" (মে, ১৯৩৮)

লোকদেরকে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাঁদের চিন্তাধারাকে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে। অবশ্য, কোনো লোকই ভিত্তিহীন 'আকাশ-কুসুম' ভাবতে পারবেন না, বাস্তব অবস্থার দ্বারা আরোপিত সীমাকে অতিক্রম করে নিজেদের কার্যকলাপের পরিকল্পনা করতে পারবেন না, কিম্বা অসম্ভবের

দিকে পা বাড়াবেন না। তবে আজকের সমস্যা হলো এই যে, দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল চিন্তাধারা বহুক্ষেত্রে কাজের ক্ষতিসাধন করছে, এবং এইসব ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতিকে বাস্তব অবস্থার বিকাশের সঙ্গে তাল রেখে চলতে দিচ্ছে না। বর্তমান সমস্যা হচ্ছে যে, যা প্রয়াসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব তা সম্পন্ন করাটা অনেকেই অসম্ভব বলে মনে করেন।

"চীনের পল্লী অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক অভ্যুত্থান"-এর ভূমিকা (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫)

আমাদের সবসময় মাথা ঘামাতে হবে এবং প্রত্যেকটি বিষয়কে বার বার যত্নের সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে। একটা সাধারণ প্রবাদ আছে, "ভ্রূ কোঁচকালেই বুদ্ধি জন্মে।" অন্য কথায়, বেশী ক'রে ভাবলেই প্রজ্ঞার উদয় হয়। আমাদের পার্টির ভেতরকার অন্ধতা দূর করার জন্য ভাবতে, বস্তুর বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে শিখে নিতে এবং বিশ্লেষণের অভ্যাস

চর্চা করতে আমাদের কমরেডদেরকে অবশ্যই উৎসাহ দিতে হবে।

"অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি" (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪)

কোনো প্রক্রিয়াতে যদি অনেকগুলো দ্বন্দ্ব থাকে তা'হলে তাদের মধ্যে অবশ্যই একটি হবে প্রধান দ্বন্দ্ব, যা নেতৃস্থানীয় ও নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করবে, আর অন্যগুলো দখল করবে গৌণ ও অধস্তন স্থান। তাই, দুই বা দু'য়ের বেশী দ্বন্দ্ববিশিষ্ট কোনো জটিল প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করতে গেলে, আমাদের অবশ্যই সেগুলির মধ্যে প্রধান দ্বন্দ্বকে খুঁজে বের করার জন্য সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একবার এই প্রধান দ্বন্দ্বকে হৃদয়ঙ্গম করা গেলে সব সমস্যারই সহজে সমাধান করা যায়।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

দু'টি দ্বন্দ্বমান দিকের মধ্যে একটি দিক অবশ্যই প্রধান, অপরটি গৌণ। যেটি প্রধান দিক, সেটিই

দ্বন্দ্বের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর প্রকৃতি প্রধানতঃ নির্ধারিত হয় দ্বন্দ্বের প্রধান দিকের দ্বারা, যে দিকটি কর্তৃত্বের স্থান লাভ করেছে।

কিন্তু এই অবস্থাটা স্থাণু নয়; দ্বন্দ্বের প্রধান ও অপ্রধান দিকগুলো একে অপরে রূপান্তরিত হয় এবং তদনুসারে বস্তুর প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়।

ঐ

আমাদের শুধু যে কর্তব্য নির্ধারণ করলেই চলবে তা নয়, বরং কর্তব্য সম্পন্ন করার পদ্ধতির সমস্যার সমাধানও করতে হবে। যদি নদী পার হওয়া আমাদের কর্তব্য হয় তা'হলে সেতু কিংবা নৌকা ছাড়া তা পার হতে আমরা পারি নে। সেতু বা নৌকা সমস্যার সমাধান না হলে নদী পার হওয়ার কথাটা একটা ফাঁকা বুলি। পদ্ধতির সমস্যার সমাধান না হলে কর্তব্য সম্পন্ন করার কথাও বাজে কথামাত্র।

"জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি যত্ন নিন, কর্মপদ্ধতির প্রতি মনোযোগ দিন" (২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)

সাধারণ ও ব্যাপক আহ্বান না জানালে কোনো কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক জনসাধারণকে সমাবেশ করা যায় না। কিন্তু যদি নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কেবলমাত্র সাধারণ আহ্বান জানিয়ে চুপ করে থাকেন, যে কাজের জন্য আহ্বান করা হয়েছে যদি তাঁরা বাস্তবে ও প্রত্যক্ষভাবে কিছুসংখ্যক সংগঠনে তা গুরুত্বের সঙ্গে কার্যকরী না করেন, কোনো একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হয়ে না যান, অভিজ্ঞতা অর্জন না করেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে অন্যান্য ইউনিটগুলোকে পরিচালনা করতে প্রয়োগ না করেন, তা'হলে তাঁদের সাধারণ আহ্বান নির্ভুল কি না তা' পরীক্ষা করার উপায় থাকে না এবং সাধারণ আহ্বানের অন্তর্বস্তুকেও সমৃদ্ধ করার উপায় থাকে না; এর ফলে, এই সাধারণ আহ্বান আদৌ ফলপ্রসূ না হতে পারে।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

নিজের অধস্তন পৃথক পৃথক ইউনিটগুলোর পৃথক পৃথক ব্যক্তি ও ঘটনা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন না করলে কোন নেতৃস্থানীয় কর্মীই সমস্ত ইউনিটকে সামগ্রিকভাবে পরিচালনা করতে পারেন না। এই পদ্ধতিকে সর্বত্র প্রসারিত করতে হবে, যাতে করে সমস্ত স্তরের নেতৃস্থানীয় কেডারগণ তাকে প্রয়োগ করতে শিখে নেন।

ঐ

কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলে একই সময়ে অনেকগুলো কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে না, একটা নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র একটা কেন্দ্রীয় কাজ থাকতে পারে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের গুরুত্বসম্পন্ন কাজ পরিপূরক হিসেবে থাকতে পারে। সেজন্য একটা অঞ্চলের মুখ্য পরিচালককে অবশ্যই সেখানকার সংগ্রামের ইতিহাস, সংগ্রামের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন রকমের কাজকে যথাযোগ্য স্থানে পরপর সাজাতে হবে; নিজে কোনো পরিকল্পনা তৈরী না করে শুধু উচ্চস্তরের নির্দেশানুসারে

এক একটা কাজ করা উচিত নয়; অমনি করলে অনেকগুলি "কেন্দ্রীয় কাজ" এবং বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। উচ্চস্তরের সংস্থার পক্ষেও কোন কাজ অপেক্ষাকৃতভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী তা নির্দেশ না ক'রে, কোনটা কেন্দ্রীয় কাজ তার উল্লেখ না করে নিম্নস্তরের সংস্থাকে একই সময়ে অনেক কাজ করতে নির্দেশ দান করা উচিত নয়, এমনি করলে নিচের স্তরের সংগঠনগুলিতে কাজের পদক্ষেপে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে এবং নির্ধারিত ফল পাওয়া যাবে না। প্রতিটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের ঐতিহাসিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে সমগ্র পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে বিবেচনা ক'রে প্রতিটি বিশেষ সময়ের জন্য কাজের ভারকেন্দ্র ও কাজের ক্রম সঠিকভাবে স্থির করা এবং তা অবিচলিতভাবে পালন করা যাতে করে নির্দিষ্ট ফললাভ সুনিশ্চিত হয়—এটাই হচ্ছে নেতৃত্বের কলাকৌশলের অঙ্গ।

(পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থাকে) প্রতিক্ষণেই কাজের অগ্রগতিকে আয়ত্তে আনতে হবে, অভিজ্ঞতার বিনিময় করতে হবে এবং ভুলগুলো সংশোধন করে নিতে হবে; সাধারণ হিসেবনিকেশ এবং ভুলের সামগ্রিক সংশোধনের জন্য সারসংকলন সভা ডাকার ব্যাপারে কয়েক মাস, আধা বছর বা পুরো এক বছর অপেক্ষা করা উচিত নয়। অপেক্ষা করলে ক্ষতি বেশী হয়, কিন্তু ভুল দেখা দেওয়া মাত্র তা সংশোধন করলে ক্ষতি কম হয়।

"শিল্প-বাণিজ্যের কর্মনীতি সম্পর্কে"
(২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮)

সমস্যাগুলো স্তূপাকারে জ'মে উঠে অনেক ঝামেলা সৃষ্টি হওয়ার প্রতীক্ষায় না থেকে, তার পূর্বেই তা সমাধান করা উচিত। পরিচালকদের

অবশ্যই আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে যেতে হবে—পিছনে প'ড়ে থাকলে চলবে না।

"ঋতু-ভিত্তিক কাজের চুক্তি"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

আমাদের প্রয়োজন হলো উৎসাহী অথচ স্থির-চিত্ত মনোবৃত্তির, প্রচণ্ড অথচ শৃংখলাপূর্ণ কাজের।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা"
(ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

২৩. তদন্ত ও পর্যালোচনা

যাঁরা বাস্তব কাজে নিযুক্ত তাঁদের প্রত্যেককে অবশ্যই নিচের স্তরের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে। যাঁরা শুধু তত্ত্ব জানেন কিন্তু বাস্তব অবস্থা জানেন না, তাঁদের জন্যই এ ধরনের তদন্ত চালান বিশেষ করে দরকার, অন্যথায়, তাঁরা তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবেন না। "তদন্ত না করলে কথা বলার অধিকার নেই", আমার এই কথাটাকে যদিও "সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদ" বলে বিদ্রূপ করা হয়েছে, তবুও একথা বলার জন্য আজও আমি অনুশোচনা করি নে; এর জন্য অনুশোচনা করা তো দূরের কথা, এই মত এখনো আমি দৃঢ়ভাবে পোষণ করি যে, তদন্ত না করলে

কথা বলার কোনো অধিকার থাকতে পারে না। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা "সরকারী গাড়ী থেকে নামা মাত্রই" হৈ চৈ করে মতামত ঘোষণা করতে থাকেন, এটার সমালোচনা করেন, ওটার নিন্দে করেন, কিন্তু আসলে তাঁদের দশজনের মধ্যে দশজনই ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ এমন অভিমত বা সমালোচনা পুংখানুপুংখ তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এগুলো নিছক অজ্ঞ গালগল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের পার্টিকে অসংখ্য বার এই সমস্ত তথাকথিত "রাজদূতদের" হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে; আর এই ধরনের "রাজদূতেরা" আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে, প্রায় সর্বত্রই বিরাজ করছে। স্তালিন ঠিকই বলেন, "বিপ্লবী অনুশীলনের সঙ্গে যুক্ত না হ'লে তত্ত্ব উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।" সঠিকভাবেই তিনি আরো বলেন, "অনুশীলন যদি বৈপ্লবিক তত্ত্বকে নিজের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ না করে, তা'হলে তা' অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায়।" যে ব্যক্তি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ায় এবং যার ভবিষ্যতের ধারণা ও দূরদৃষ্টির অভাব

আছে সেই ''বাস্তববাদী ব্যক্তি'' ছাড়া আর কাউকে ''সংকীর্ণ অভিজ্ঞতাবাদী'' ব'লে আখ্যায়িত করা উচিত নয়।

"'পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের' ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি'' (মার্চ, এপ্রিল, ১৯৪১)

এই ধরনের মনোভাবই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা থেকে সত্য সন্ধানের মনোভাব। বাস্তবে যা আছে সে সবই হচ্ছে ''প্রকৃত অবস্থা'', ''সত্যের'' অর্থ হচ্ছে তাদের আভ্যন্তরীণ সংযোগ, অর্থাৎ সেগুলির নিয়ন্ত্রণকারী বিধি-নিয়ম, এবং ''সন্ধানের'' অর্থ হচ্ছে পর্যালোচনা করা। দেশ, প্রদেশ, জেলা অথবা মহকুমার ভেতরের ও বাইরের প্রকৃত অবস্থা থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে এবং সেগুলি থেকেই আমরা আহরণ করবো সেগুলির মধ্যে সম্পৃক্ত কিন্তু কাল্পনিক নয় এমন বিধি-নিয়ম, অর্থাৎ আমাদের পরিপার্শ্বে যেসব ঘটনা ঘটছে সেগুলির আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক আমরা বের করবো এবং তা আমাদের কার্যকলাপের দিশারী হিসেবে গ্রহণ করবো। এটা করতে

হলে অবশ্যই আত্মমুখী কল্পনা, ক্ষণিকের উৎসাহে মেতে উঠা এবং প্রাণহীন পুস্তকের উপরে নির্ভর করা চলবে না, নির্ভর করতে হবে তথ্যের উপর যা বাস্তবে বিদ্যমান; উপকরণগুলোকে আমাদের অবশ্যই পুংখানুপুংখভাবে আয়ত্ত করতে হবে এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সাধারণ নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে এগুলো থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে।

''আমাদের অধ্যয়ন সংস্কার করুন'' (মে, ১৯৪১)

''চোখ বুজে চড়ুই ধরা'', কিম্বা ''কানা লোকের মাছ ধরার'' মতো আচরণ করা, স্থূল ও বেখেয়াল হওয়া, বাগাড়ম্বরের প্রশ্রয় দেওয়া, ভাসাভাসা জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা—এইরূপ জঘন্য খারাপ রীতি এখনো আমাদের পার্টির অনেক কমরেডের মধ্যে রয়েছে; এই রীতি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন আমাদের শিখিয়েছেন বিবেকবুদ্ধি দিয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করতে এবং আত্মমুখী আকাংক্ষা

থেকে নয়, বাস্তবমুখী আসল অবস্থা থেকে শুরু করতে; কিন্তু আমাদের অনেক কমরেড সরাসরি এ সত্যের পরিপন্থী কাজ করেন।

ঐ

আপনি কি কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারছেন না? তা'হলে, আপনি সেই সমস্যার বর্তমান অবস্থা ও তার ইতিহাস অনুসন্ধান করুন! সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে সমস্যাটি সম্পর্কে তদন্ত করলে তার সমাধান করার উপায় আপনি পাবেন। সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তদন্তের পরে—আগে নয়। শুধু কোনো নির্বোধ ব্যক্তি একা অথবা সদলবলে তদন্ত না করেই মূর্খের মতো মাথা ঘামিয়ে ''উপায় ভাবতে থাকে'', কিম্বা ''ধারণা গড়তে থাকে''। এ কথা বুঝতে হবে যে এইভাবে কোনো ভাল উপায় ভেবে বের করতে পারা যায় না এবং কোনো ভাল ধারণা গড়ে তোলা যায় না।

''বই পূজার বিরোধিতা করুন''
(মে, ১৯৩০)

তদন্ত হচ্ছে ''সুদীর্ঘ দশমাসব্যাপী গর্ভধারণের'' মতোই, আর সমস্যার সমাধান ''কোনো সুন্দর প্রভাতে শিশুর জন্মলাভের'' মতো। বস্তুতঃ তদন্তই হচ্ছে সমস্যার সমাধান।

ঐ

(মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মনোভাবে,) কোনো ব্যক্তি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে চারদিকের পরিবেশের সুব্যবস্থিত ও পুংখানুপুংখ তদন্ত ও পর্যালোচনা ক'রে থাকে। কেবলমাত্র উৎসাহের উপর নির্ভর করেই কাজ করা চলবে না বরং স্তালিনের কথানুযায়ী, বিপ্লবী মনোবলকে বাস্তবনিষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে।

''আমাদের অধ্যয়ন সংস্কার করুন''
(মে, ১৯৪১)

অবস্থাকে জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সামাজিক তদন্ত চালানো, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত চালানো। যাঁরা কাজ পরিচাল-

নার ভার নিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে অবস্থাকে জানবার সবচেয়ে মৌলিক পদ্ধতি হচ্ছে সুপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি শহর ও গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে মার্কসবাদের মৌলিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে, অর্থাৎ শ্রেণী বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে সেসব জায়গায় কয়েকবার পুংখানুপুংখ তদন্ত চালানো।

"'পল্লীর তথ্যানুসন্ধানের' ভূমিকা ও ক্রোড়লিপি" (মার্চ, এপ্রিল, ১৯৪১)

বাস্তব অবস্থার অনুসন্ধান সভায় প্রত্যেকবারই বেশী লোকের উপস্থিত থাকার দরকার নেই; তিন থেকে পাঁচ কিংবা সাত বা আটজন হলেই যথেষ্ট। এর জন্য অবশ্যই যথেষ্ট সময় দিতে হবে, অনুসন্ধান-সূচী অবশ্যই থাকতে হবে, আর অবশ্যই নিজের মুখে জিজ্ঞাসা করতে হবে, প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে নিতে হবে এবং সভায় উপস্থিত লোকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। তাই বুকভরা উৎসাহ ছাড়া, নীচের দিকে তাকানোর দৃঢ়-সংকল্প ছাড়া, জ্ঞান লাভের পিপাসা ছাড়া এবং বিশ্রী অতিদাম্ভিকতার

আচরণ ত্যাগ করা ছাড়া ও আগ্রহশীল ছাত্র হবার মনোভাব ছাড়া নিশ্চয়ই এই কাজ করা অসম্ভব, কিম্বা তা ভালভাবে করা অসম্ভব।

ঐ

কমাণ্ডারের নির্ভুল বিন্যাসব্যবস্থা আসে তাঁর নির্ভুল সিদ্ধান্ত থেকে, তাঁর নির্ভুল সিদ্ধান্ত আসে তাঁর নির্ভুল বিচার-বিবেচনা থেকে, তাঁর নির্ভুল বিচার-বিবেচনা আসে পুংখানুপুংখ ও প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ থেকে এবং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে সংগৃহীত তথ্যগুলোকে একসূত্রে গেঁথে চিন্তা করা থেকে। কমাণ্ডার পর্যবেক্ষণের সমস্ত সম্ভাব্য ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত শত্রুর অবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলোর উপর চিন্তা করেন—গাদ পরিত্যাগ করে সারবস্তু বেছে নেন, মিথ্যাকে বাদ দিয়ে সত্যকে গ্রহণ করেন, এক বিষয় থেকে শুরু ক'রে অন্য বিষয়ে যান, এবং বাহির থেকে শুরু ক'রে ভেতরে যান; তারপর তিনি তাঁর নিজের পক্ষের অবস্থাকে বিবেচনা করেন এবং উভয় পক্ষের

তুলনামূলক ও পারস্পরিক সম্পর্কের পর্যালোচনা করেন; এমনি করেই তিনি অভিমত গঠন করেন, নিজের মন স্থির করেন এবং পরিকল্পনা রচনা করেন। রণনীতিগত পরিকল্পনা, যুদ্ধাভিযানের পরিকল্পনা বা লড়াইয়ের পরিকল্পনা রচনা করার পূর্বে রণবিশারদের পক্ষে অবস্থাকে জানার এটাই হচ্ছে সামগ্রিক প্রক্রিয়া।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা" (ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

২৪. ভুল চিন্তাধারার সংশোধন

আমরা নিজেদের কাজে খুব বিরাট সাফল্য অর্জন করলেও তা নিয়ে আমাদের অহঙ্কার বা আত্মাভিমান করার কোনো যুক্তিই নেই। বিনয় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আর অহঙ্কার তাকে পিছনে টেনে রাখে এই সত্যকে আমাদের অবশ্যই সর্বদা মনে রাখতে হবে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

বিজয়লাভের কারণে পার্টির ভেতরে অহঙ্কারের মনোভাব, নিজেকে নিজে কৃতবীর বলে জাহির করার মনোভাব, প্রগতির প্রতি জড়তা ও অনিচ্ছার মনোভাব, ভোগবিলাসের প্রতি অনুরাগ এবং কঠোর জীবন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাবার প্রতি বিরাগের মনোভাব জন্মাতে পারে। বিজয়লাভ করলে জনগণ আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন, বুর্জোয়াশ্রেণীও আমাদের তোষামোদ করতে এগিয়ে আসবে। শত্রুরা অস্ত্রশক্তির দ্বারা আমাদের জয় করতে পারে না একথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে, আমাদের বাহিনীতে যাঁরা দুর্বলমতি সম্পন্ন তাঁদেরকে বুর্জোয়া-শ্রেণী তোষামোদ করে জয় করে নিতে পারে। এমন কমিউনিস্টও সম্ভবতঃ কিছু কিছু থাকতে পারেন, যাঁরা বন্দুকধারী শত্রুর দ্বারা বশীভূত হন নি এবং তাঁরা এই শত্রুদের মোকাবিলায় বীর উপাধি পাবার যোগ্য ছিলেন; কিন্তু তাঁরা চিনির প্রলেপে আচ্ছাদিত গোলার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেন না; তাঁরা এই চিনির প্রলেপ দেওয়া গোলার দ্বারা পরাজিত হবেন। আমাদের অবশ্যই এই ধরনের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

এমন বহু জিনিস আছে যার মধ্যে অন্ধভাবে ও অসতর্কভাবে জড়িয়ে পড়লে সেই সব কিছু আমাদের বোঝা ও ভার হয়ে উঠতে পারে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ভুল করে কেউ এমন মনে করতে পারেন—"যাই হোক না কেন, আমি ভুল করেছি"—কাজেই তিনি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন; যে লোক ভুল করেন নি, তিনিও মনে করতে পারেন যে—"আমি তো কোনো ভুল করি নে"—কাজেই তিনি গর্বে ফুলে উঠেন। কাজের অসফলতা লোককে নিরাশ ও ম্লান করতে পারে; আবার সফলতা তাকে অহঙ্কারী ও উদ্ধত ক'রে তুলতে পারে। অল্পকাল ধ'রে সংগ্রামে নিরত বলে কোনো কোনো কমরেড দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে পারেন, আবার দীর্ঘকাল ধ'রে সংগ্রাম করছেন ব'লে কোন প্রবীণ কমরেড

নিজে সবসময় অভ্রান্ত এমন মনে করতে পারেন। শ্রমিক ও কৃষক কমরেডরা নিজেদের শ্রেণীভিত্তির গৌরবে বুদ্ধিজীবীদেরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারেন; আবার বুদ্ধিজীবীরাও নিজেদের কোনো না কোনো জ্ঞান আছে ব'লে শ্রমিক-কৃষকদেরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে পারেন। যে কোনো বিশেষ জ্ঞান মূলধন হিসেবে ব্যবহার করা হতে পারে এবং তার ফলে সেই ব্যক্তি দাম্ভিক হয়ে উঠতে পারে, আর অন্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারে। এমন কি বয়সও আত্ম-অহঙ্কারের কারণ হয়ে উঠতে পারে : যুবকরা নিজেরা বুদ্ধিমান ও কর্মঠ বলে বৃদ্ধদের অবহেলা করতে পারেন, আবার বৃদ্ধরাও নিজেরা অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ বলে যুবকদের অবজ্ঞা করতে পারেন। এই ধরনের সমস্ত জিনিসের প্রতি আমরা যদি সমালোচনামূলকভাবে সতর্ক না থাকি, তা'হলে এগুলো আমাদের ভার অথবা বোঝা হয়ে উঠতে পারে।

"অধ্যয়ন ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি" (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪)

সৈন্যবাহিনীতে কার্যরত কিছুসংখ্যক কমরেড অহঙ্কারী হয়ে উঠেছেন, তাঁরা সৈনিক, জনগণ, সরকার ও পার্টির প্রতি অতিশয় উদ্ধত ব্যবহার করেন, তাঁরা সবসময় স্থানীয় কার্যে নিয়োজিত কমরেডদের নিন্দা করেন কিন্তু কখনো নিজেদের নিন্দা করেন না, নিজেদের সাফল্যকে কেবল দেখেন, ত্রুটি দেখেন না এবং তোষামোদের কথাই শুনতে পছন্দ করেন, সমালোচনা নয়। . . . . . . এই ধরনের ব্যাধি দূর করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে অবশ্যই সচেষ্ট হ'তে হবে।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

কঠিন কাজ যেন আমাদের সামনে রাখা একটা বোঝার মতো, সেটাকে কাঁধে তুলে নেবার সাহস আমাদের আছে কি না তা যাচাই করবার জন্যই তাকে রাখা। কোনো কোনো বোঝা ভারী এবং কোনো কোনোটা বা হাল্কা হয়ে থাকে। কেউ কেউ ভারীটাকে ভয় করেন, হাল্কাটাকে গ্রহণ

করেন; ভারীগুলো অন্যদের কাঁধে ঠেলে দিয়ে তাঁরা হাল্কাগুলো নিজেরা তুলে নেন। এই মনোভাব ভাল নয়। কোনো কোনো কমরেড এ ধরনের নন; তাঁরা আয়েস আরাম অপরের জন্য ছেড়ে দিয়ে ভারী বোঝা নিজেরা তুলে নেন; তাঁরা সবার আগে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে আসেন আর আয়েস আরাম ভোগ করার বেলায় সবার পিছনে পড়েন। এই ধরনের কমরেডই হচ্ছেন ভাল কমরেড। তাঁদের এই কমিউনিস্ট ভাব-মানস থেকে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে"
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিজেদের কাজে দায়িত্বজ্ঞানহীন, তাঁরা ভারীটা বাদ দিয়ে হাল্কাটা গ্রহণ করেন, ভারী বোঝাগুলো তাঁরা অন্যদের কাঁধে ঠেলে দেন এবং নিজেরা হাল্কাটা তুলে নেন। যদি তাঁদের সামনে কোনো কাজ পড়ে, তা'হলে প্রথমে তাঁরা নিজেদের কথা ভাবেন, তারপর ভাবেন

অন্যদের কথা। সামান্য একটা কাজ করলেই তাঁরা আত্ম-অহমিকায় মেতে উঠেন, নিজেদের কাজের বড়াই করতে তাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা এই ভয় করেন যে তাঁদের কাজ সম্পর্কে হয়তো অপরে জানতে পারবে না। তাঁরা কমরেড ও জনগণের সঙ্গে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না, বরং নিষ্প্রাণ, উদাসীন ও নির্দয় ব্যবহার করেন। আসলে, এই ধরনের লোক কমিউনিস্ট নন, অন্ততঃপক্ষে তাঁদের প্রকৃত কমিউনিস্ট বলে ধরা যায় না।

"নর্ম্যান বেথ্যুনের স্মরণে" (২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

এই ধরনের "স্বতন্ত্রতার" দাবীদাররা সাধারণতঃ "আমি প্রথম"—এই নীতির সঙ্গে গাঁট-ছড়ায় আবদ্ধ এবং তাঁরা ব্যক্তি-বিশেষ ও পার্টির মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নে সাধারণতঃ ভুল করে থাকেন। তাঁরা যদিও মুখে পার্টিকে সম্মান করেন, কিন্তু কার্যতঃ তাঁরা নিজেদেরকেই প্রথম স্থান দেন এবং পার্টিকে দেন দ্বিতীয় স্থান। এই ধরনের লোক কিসের ধান্দায়

ঘুরছেন ? তাঁরা খ্যাতি, পদ ও আত্মপ্রচারের পেছনে ঘুরছেন। কাজের কোনো একটা অংশের দায়িত্ব তাঁদের দিলে তাঁরা নিজেদের "স্বতন্ত্রতার" দাবী তোলেন। এর উদ্দেশ্যে তাঁরা কিছু লোককে পক্ষে টেনে আনেন আর কিছু লোককে ঠেলে সরিয়ে রাখেন এবং কমরেডদের মধ্যে বড়াই, তোষামোদ ও দালালির আমদানি করেন, এইভাবে তাঁরা বুর্জোয়া-শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টির অমার্জিত রীতিনীতিকে কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে নিয়ে আসেন। তাঁদের অসততাই তাঁদের জন্য নিয়ে আসে দুঃখ-দুর্দশা। আমি মনে করি আমাদের সৎভাবে কাজ করা উচিত, কারণ পৃথিবীতে কোনো কাজ সম্পন্ন করতে হলে সৎ মনোভাব ছাড়া তা করা একেবারেই অসম্ভব।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

আংশিক প্রয়োজনকে সামগ্রিক প্রয়োজনের অধীনে আনার নীতিকে কমিউনিস্টদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে। যদি কোনো প্রস্তাব আংশিক

পরিস্থিতির বিচারে কার্যকর বলে মনে হয়, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে মনে হয় অকার্যকর, তা'হলে অংশকে সমগ্রের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। এর বিপরীত অবস্থায় যদি কোনো প্রস্তাব আংশিক পরিস্থিতির বিচারে অকার্যকর বলে মনে হয়, কিন্তু সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে মনে হয় কার্যকর, তা'হলেও অংশকে সমগ্রের জন্য পথ ছেড়ে দিতে হবে। এটাকেই বলে পরিস্থিতির সামগ্রিক বিবেচনা।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

ভোগবাদ। লাল ফৌজেও বেশ কিছু লোক আছেন যাঁদের ব্যক্তিতাবাদ ভোগবিলাসকামিতার মধ্যে প্রকাশ পায়। তাঁরা সব সময়েই আশা করেন যে, তাঁদের বাহিনী বড় বড় শহরে প্রবেশ করবে। তাঁরা সেখানে যেতে চান নিজেদের ভোগবিলা-সের জন্য, কাজ করার জন্য নয়। জীবন যাত্রা

যেখানে কঠোর সেই লাল এলাকায় কাজ করতে তাঁরা সবচেয়ে বেশী অনিচ্ছুক।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

আমাদের অবশ্যই স্ববিভাগীয়বাদী ঝোঁকের বিরোধিতা করতে হবে; এই ঝোঁকের দ্বারা শুধু নিজের বিভাগের স্বার্থেরই যত্ন নেওয়া হয়, অপরের কথা চিন্তা করা হয় না। যিনি অন্যের বাধাবিপত্তির প্রতি উদাসীন থাকেন, অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও অধস্তন কেডারদের অন্য বিভাগে যেতে দিতে অস্বীকার করেন অথবা কেবল নিম্নমানের যোগ্যতা সম্পন্ন কেডারদেরই অন্যত্র পাঠান, "প্রতিবেশীর জমিকে তার বাড়তি জল নিষ্কাশনের নালী হিসেবে ব্যবহার করেন" এবং অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল বা মানুষের জন্য মোটেও ভাবেন না—তিনিই হচ্ছেন স্ববিভাগীয়বাদী যিনি কমিউনিজমের ভাব-মানস একেবারেই হারিয়ে ফেলেছেন। সমগ্রের প্রতি অমনোযোগী থাকা এবং অন্যান্য বিভাগ, অঞ্চল ও লোকের প্রতি যত্নহীন থাকাই হচ্ছে স্ববিভাগীয়-বাদীর বৈশিষ্ট্য। এই ধরনের লোকদের শিক্ষাদা-নের কাজ আমাদেরকে অবশ্যই জোরদার করতে হবে যাতে করে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, স্বার্থপর স্ববিভাগীয়বাদ হলো একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক এবং যদি একে বাড়তে দেওয়া হয়, তা'হলে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠবে।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

উদারতাবাদ বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রকাশ করে।

যখন সুস্পষ্টই দেখা যায় যে, কোনো লোক ভুল পথে যাচ্ছেন, অথচ সে লোক একজন পুরানো পরিচিত লোক, একই জায়গার অধিবাসী, সহপাঠী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রিয়জন, পুরানো সহকর্মী বা পুরানো অধস্তন লোক ব'লে তাঁর সঙ্গে নীতির ভিত্তিতে যুক্তিতর্ক না করা, শান্তি ও সখ্যতা বজায় রাখার জন্য অবস্থার অবনতি ঘটতে দেওয়া। অথবা তাঁর

সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য হাল্কাভাবে কিছু বলা, কিন্তু চূড়ান্তভাবে মীমাংসার চেষ্টা না করা। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তি-বিশেষ উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে প্রথম প্রকারের উদারতাবাদ।

নিজের প্রস্তাব সংগঠনের সামনে সক্রিয়ভাবে উত্থাপন না করে আড়ালে দায়িত্বজ্ঞানহীন সমালোচনার প্রশ্রয় দেওয়া। সামনা-সামনি কিছু না ব'লে পেছনে বাজে গুজব রটনা করা; সভায় কিছু না বলা কিন্তু পরে আজে বাজে কথা বলা। যৌথ জীবনযাত্রার নীতির প্রতি আদৌ কোনো প্রকার শ্রদ্ধা না দেখিয়ে নিজের ঝোঁকে চলা। এটা দ্বিতীয় প্রকারের।

যদি কোনো ব্যাপার নিজকে স্পর্শ না করে, তা'হলে তাকে শিকেয় তুলে রাখা; কোনো বিষয়কে স্পষ্টতঃই ভুল জেনেও সে বিষয় সম্পর্কে যথাসম্ভব কম বলা; বিষয়কর্মে বিজ্ঞ হওয়া, এবং গা বাঁচিয়ে চলা ও কেবলমাত্র দোষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা। এটা তৃতীয় প্রকারের।

আদেশ অমান্য করা এবং ব্যক্তিগত মতামতকে

প্রথম স্থান দেওয়া। সংগঠনের কাছ থেকে শুধু বিশেষ সুবিধা দাবি করা, কিন্তু সংগঠনের শৃংখলা অস্বীকার করা। এটা চতুর্থ প্রকারের।

ঐক্য, অগ্রগতি বা সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য ভুল মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যুক্তিতর্ক না করা, বরং ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো, ঝগড়া বাধানো, ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করা বা প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করা। এটা পঞ্চম প্রকারের।

ভুল মতামত শুনেও যুক্তিতর্ক না করা, এমন কি প্রতিবিপ্লবী মন্তব্য শুনেও সে সম্বন্ধে কোনো রিপোর্ট না করা, বরং সেগুলো নির্বিকারভাবে গ্রহণ করা যেন কিছুই ঘটে নি। এটা ষষ্ঠ প্রকারের।

জনসাধারণের মধ্যে থেকেও তাঁদের মধ্যে প্রচার না চালানো, তাঁদেরকে উৎসাহিত না করা, সভায় বক্তৃতা না দেওয়া, তাঁদের মধ্যে তদন্ত ও অনুসন্ধান না করা, তাঁদের সুখদুঃখের প্রতি কোনো রকম যত্ন না নেওয়া, বরং তাঁদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা এবং নিজে যে একজন কমিউনিস্ট সে কথা

ভুলে নিজেকে হেয় করে একজন সাধারণ লোকের মতো আচরণ করা। এটা সপ্তম প্রকারের।

জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতিকর আচরণ দেখেও মনে কোনো ক্ষোভ অনুভব না করা, তাকে উপদেশ দিয়ে বিরত না করা, না থামানো, যুক্তি দিয়ে তাকে না বুঝানো, বরং জেনে শুনেও তাকে সে কাজ করে যেতে দেওয়া। এটা অষ্টম প্রকারের।

কাজকর্মে মনোযোগ না দেওয়া, কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা লক্ষ্য ছাড়াই কাজ করা, যেন-তেন প্রকারে কাজ করা এবং কোনো মতে চলনসই হওয়া—"যতদিন মঠের সন্ন্যাসী থাকবো ততদিন ঘণ্টা বাজিয়েই যাবো"। এটা নবম প্রকারের।

বিপ্লবের জন্য নিজে বিরাট অবদান রেখেছেন বলে মনে করা, প্রবীণ অভিজ্ঞ বলে নিজেকে জাহির করা, বড় কাজে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ছোট কাজ করতে ঘৃণা করা, কাজে অমনোযোগী হওয়া এবং পড়াশুনায় ঢিল দেওয়া। এটা দশম প্রকারের।

নিজের ভুল জানতে পেরেও তা সংশোধনের

চেষ্টা না করা, নিজের প্রতি উদার মনোভাব অবলম্বন করা। এটা একাদশ প্রকারের।

"উদারতাবাদের বিরোধিতা কর" (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

বিপ্লবী যৌথ সংগঠনের ভেতরে উদারতাবাদ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটা হচ্ছে একটা ক্ষয়কারক বস্তু যা ঐক্য ছিন্ন করে, সম্পর্ক শিথিল করে, কাজে নিষ্ক্রিয়তা আনে এবং মতভেদ সৃষ্টি করে। এটা বিপ্লবী বাহিনীকে দৃঢ় সংগঠন ও শৃংখলা থেকে বঞ্চিত করে, কর্মনীতিগুলোকে পুরোপুরি কার্যকরী করা অসম্ভব করে তুলে এবং পার্টি যাঁদের পরিচালনা করে সেই জনসাধারণ থেকে পার্টি-সংগঠনকে পর করে দেয়। এটা অত্যন্ত খারাপ ঝোঁক।

ঐ

উদারতাবাদীরা মার্কসবাদের নীতিগুলোকে বিমূর্ত বেদবাক্যের মতো মনে করেন। মার্কসবাদকে তাঁরা অনুমোদন করেন, কিন্তু তাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে বা পুরোপুরি প্রয়োগ করতে তাঁরা

প্রস্তুত নন, নিজেদের উদারতাবাদের পরিবর্তে মার্কসবাদকে গ্রহণ করতেও তাঁরা তৈরী নন। এই সব লোকের আছে তাঁদের মার্কসবাদ, আবার তাঁদের উদারতাবাদও আছে: মুখে তাঁরা মার্কসবাদের কথা বলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ; অন্যদের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করেন মার্কসবাদ, কিন্তু নিজেদের প্রতি প্রয়োগ করেন উদারতাবাদ। দুই ধরনের জিনিসই তাঁরা মজুদ রাখেন, এবং প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক ব্যবহার করেন। কোন কোন লোকের চিন্তা এইভাবে কাজ করে থাকে।

ঐ

জনগণের রাষ্ট্র জনগণকে রক্ষা করে। শুধু জনগণের রাষ্ট্র থাকলেই জনগণ সারা দেশব্যাপী ও সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা নিজেদেরকে শিক্ষিত ও পুনর্গঠিত করতে পারবেন, স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রভাব (যা এখনো খুবই জোরদার, যা দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান থাকবে এবং যাকে দ্রুত বিনাশ করা যায় না) থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারবেন, পুরানো সমাজ থেকে প্রাপ্ত বদভ্যাস ও খারাপ মতাদর্শ দূর ক'রে দিতে পারবেন, প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা নিজেদেরকে বিপথে চালিত হতে দেবেন না এবং অব্যাহতভাবে অগ্রসর হতে থাকবেন—অগ্রসর হতে থাকবেন সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের দিকে।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

একটুখানি ভাল কাজ করা কারো পক্ষেই কঠিন নয়, কঠিন হচ্ছে সারা জীবন ধ'রে ভাল কাজ করা, কখনো কোনো খারাপ কাজ না করা, ব্যাপক জনসাধারণ, তরুণ সম্প্রদায় ও বিপ্লবের স্বার্থে অবিচলভাবে কাজ ক'রে যাওয়া, এবং কয়েক দশক বছর ধ'রে একটানা কঠোর সংগ্রামে নিয়োজিত থাকা। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ!

"কমরেড উ ইয়ু-চাংয়ের ৬০তম জন্ম দিবসে অভিনন্দন বাণী" (১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০)

২৫. ঐক্য

আমাদের রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, জনগণের ঐক্য ও দেশের ভেতরকার বিভিন্ন জাতির ঐক্য—এগুলোই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্যের নিশ্চিত সিদ্ধিলাভের মৌলিক গ্যারান্টি।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের মাধ্যমেই সমগ্র শ্রেণী ও সমগ্র জাতির ঐক্য অর্জন করা যায়, কেবলমাত্র সমগ্র শ্রেণী ও সমগ্র জাতির ঐক্যের

মাধ্যমেই শত্রুকে পরাজিত করা যায় এবং জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করা যায়।

"কোটি কোটি জনসাধারণকে জাপান-বিরোধী জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্টে আনার জন্য সংগ্রাম কর" (৭ই মে, ১৯৩৭)

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সংগঠন ও শৃংখলার মূলনীতিতে আমরা পার্টির সকল শক্তিকে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ করবো। যে কোনো কমরেডই পার্টির কর্মসূচী, পার্টির সংবিধান ও পার্টির সিদ্ধান্তকে মেনে চলবেন তাঁর সঙ্গেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হব।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট রূপদান করার জন্য ১৯৪২ সালে আমরা একটা সূত্র দিয়েছিলাম, তা হ'ল "ঐক্য—সমালোচনা—ঐক্য"। বিশদভাবে

বলতে গেলে, এর অর্থ হলো ঐক্যের আকাংক্ষা নিয়ে শুরু করা, সমালোচনা অথবা সংগ্রামের মাধ্যমে দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা, যাতে একটা নতুন ভিত্তিতে নতুন ঐক্যে উপনীত হওয়া যায়। আমাদের অভিজ্ঞতা অনুসারে এটাই জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার সঠিক পদ্ধতি।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

আমাদের এই সৈন্যবাহিনী তার ভেতরকার লোকজনদের মধ্যে ও তার বাইরের লোকজনদের সঙ্গে একটা চমৎকার ঐক্য অর্জন করেছে। এর ভেতরের ঐক্য রয়েছে অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে, ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মধ্যে এবং সামরিক কাজ, রাজনৈতিক কাজ ও পশ্চাদ্বর্তী পরিচর্যা কাজের মধ্যে; আর বাইরের ঐক্য রয়েছে সৈন্য-বাহিনী ও জনগণের মধ্যে, সৈন্যবাহিনী ও

সরকারের মধ্যে এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী ও মিত্র সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। যা কিছু এই ঐক্যের ক্ষতি করে সে সবকিছুকে অবশ্যই দূর করতে হবে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

২৬. শৃংখলা

জনগণের ভেতরে, গণতন্ত্র কেন্দ্রিকতার সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং স্বাধীনতা শৃংখলার সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ সবই হচ্ছে একটি একক বস্তুর দু'টি বিপরীত দিক, তারা পরস্পর বিরোধী, আবার ঐক্যবদ্ধও; আমাদের একটার উপর একতরফাভাবে জোর দিয়ে অন্যটাকে অস্বীকার করা উচিত নয়। জনগণের নিজেদের মধ্যে স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের যেমন চলে না, তেমনি শৃংখলা ছাড়াও চলে না; গণতন্ত্র ছাড়া আমাদের চলে না, কেন্দ্রিকতা ছাড়াও চলে না। গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতার এই একত্ব, স্বাধীনতা ও শৃংখলার এই একত্বের অর্থ হচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা। এই ব্যবস্থায় জনগণ ব্যাপক গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করেন; কিন্তু

একই সময়ে তাঁদেরকে আবার সমাজতান্ত্রিক শৃংখলার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতেই হয়।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

অবশ্যই পার্টির শৃংখলাকে আমাদের পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে; সেগুলি হলো:

(১) ব্যক্তি সংগঠনের অনুগত;
(২) সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অনুগত;
(৩) নিম্নতর স্তর উচ্চতর স্তরের অনুগত;
(৪) সমগ্র পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির অনুগত।

যে কেউ শৃংখলার এই বিধিগুলিকে লংঘন করে, সে-ই পার্টির ঐক্যকে বিনষ্ট করে।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

পার্টির অন্যতম শৃংখলা হলো সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর অনুগত। সংখ্যালঘুর মতামত যদি বাতিল

করা হয়, তা'হলে সংখ্যাগুরুর গৃহীত সিদ্ধান্তকে তাঁদের অবশ্যই সমর্থন করতে হবে। প্রয়োজন হলে পরবর্তী সভায় তা আলোচনার জন্য পুনরায় পেশ করা যেতে পারে, কিন্তু কার্যকলাপে গৃহীত সিদ্ধান্তের কোনো রকম বিরোধিতা করা চলবে না।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

শৃংখলার তিনটি প্রধান বিধি নিম্নরূপ:

(১) সকল কাজকর্মে আদেশ মেনে চলুন;

(২) জনসাধারণের কাছ থেকে একটি সূচ কিংবা সামান্য সূতোও নেবেন না;

(৩) দখলকৃত সমস্ত জিনিস জমা দেবেন।

মনোযোগ দেবার আটটি বিষয় নিম্নরূপ:

(১) ভদ্রভাবে কথা বলুন;

(২) ন্যায্য মূল্যে কেনা-বেচা করুন;

(৩) ধার করা প্রতিটি জিনিস ফেরৎ দিন;

(৪) কোনো জিনিস নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ করুন;

(৫) লোককে মারবেন না বা গাল দেবেন না;

(৬) ফসল নষ্ট করবেন না;

(৭) নারীদের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করবেন না;

(৮) বন্দী সৈন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবেন না।

"শৃংখলার তিনটি প্রধান বিধি ও মনোযোগ দেবার আটটি বিষয় পুনর্ঘোষণা সম্পর্কে চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের সদর দপ্তরের নির্দেশ" (১০ই অক্টোবর, ১৯৪৭)

তাদের (আমাদের সেনাবাহিনীর সকল অফিসার ও সৈনিকদের) শৃংখলাবোধকে অবশ্যই উন্নত করতে হবে, দৃঢ়তার সঙ্গে আদেশ পালন করতে হবে, আমাদের কর্মনীতি কার্যকরী করতে হবে, শৃংখলার তিনটি প্রধান বিধি ও মনোযোগ দেবার আটটি বিষয় মেনে চলতে হবে, সৈন্যবাহিনী ও জনগণকে এক হ'তে

হবে, সৈন্যবাহিনী ও সরকারকে এক হ'তে হবে, অফিসার ও সৈনিকদেরকে এক হ'তে হবে এবং সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে এক হ'তে হবে; কোনো রকম শৃংখলা ভঙ্গের অনুমতি দেবেন না।

"চীনা গণ-মুক্তি ফৌজের ইস্তাহার"
(অক্টোবর, ১৯৪৭)

২৭. সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা

কমিউনিস্ট পার্টি সমালোচনাকে ভয় করে না, কারণ আমরা মার্কসবাদী, সত্য আমাদের পক্ষে এবং মূল জনসাধারণ—শ্রমিক ও কৃষকরা আমাদের পক্ষে।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ"
(১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

পুরাদস্তুর বস্তুবাদীরা নির্ভীক; আমরা আশা করি, আমাদের সঙ্গে একত্রে সংগ্রামরত সবাই সাহসের সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব বহন করবেন, বাধা-

বিঘ্নকে অতিক্রম করবেন, অবস্থার অবনতিতে ভয় পাবেন না, উপহাসকেও ভয় করবেন না এবং আমাদের কমিউনিস্টদের সমালোচনা করতে এবং আমাদের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে ইতস্ততঃ করবেন না। ''ক্ষতবিক্ষত হয়ে মরতেও যে ভয় পায় না সে-ই সম্রাটকে টেনে মাটিতে নামাতে সাহস করে''—সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামে আমাদের অবশ্যই এই ধরনের অদম্য মনোবল থাকতে হবে।

ঐ

সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা—এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হাতিয়ার আমাদের রয়েছে। আমরা খারাপ কর্মরীতিকে ত্যাগ করতে পারি এবং ভাল কর্মরীতি বজায় রাখতে পারি।

''চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট'' (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

বিবেকবুদ্ধি দিয়ে আত্মসমালোচনা করা অন্যসব রাজনৈতিক পার্টির থেকে আমাদের পার্টির পার্থক্য-নির্দেশের আর একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন। যেমন আমরা বলি, ঘরে নিয়মিত ঝাড়ু দিতে হবে, ঝাড়ু না দিলে ধূলো জমবে ; মুখ নিয়মিত ধুতে হবে, না ধুলে মুখও নোংরা হয়ে যাবে ; তেমনি আমাদের কমরেডদের চিন্তাধারায় ও আমাদের পার্টির কাজেও ধূলো জমতে পারে, তাও ঝাড়ু দেওয়া ও ধোওয়া প্রয়োজন। ''স্রোতের জল দূষিত হয় না, কপাটের কব্জা পোকায় খায় না''—এ প্রবাদের অর্থ হচ্ছে, অবিরাম গতি জীবাণু বা অন্যান্য জীবসত্তার অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করে। আমাদের পক্ষে, আমাদের কাজকে নিয়মিত-ভাবে যাচাই করা, যাচাইয়ের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতির বিকাশ ঘটান, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভয় না করা এবং ''যা জানেন বলুন, এবং সবটাই বলুন'', ''বক্তাকে দোষ দেবেন না, তাঁর কথাকে সতর্ক বাণী হিসেবে গ্রহণ করুন'', ''ভুল ক'রে থাকলে তাকে শুধরে নিন, না ক'রে থাকলে তার বিরুদ্ধে সতর্ক হোন'', এইসব উত্তম জনপ্রিয় চীনা নীতি-

কথার অনুশীলন করা—এটাই হচ্ছে আমাদের কমরেডদের চিন্তাধারায় ও আমাদের পার্টির দেহে নানা রকম রাজনৈতিক ধূলো ও রাজনৈতিক জীবাণুর অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করার একমাত্র কার্যকরী উপায়।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

পার্টির ভেতরে বিভিন্ন রকমের চিন্তাধারার বৈপরীত্য ও সংগ্রাম নিরন্তর ঘটতে থাকে। এ হচ্ছে পার্টির ভেতরে সমাজের শ্রেণীসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্বের এবং নূতন ও পুরাতনের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রতিফলন। পার্টির ভেতরে যদি কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে এবং তা সমাধান করার জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকে, তা'হলে পার্টির জীবন শেষ হয়ে যাবে।

"দ্বন্দ্ব সম্পর্কে" (আগষ্ট, ১৯৩৭)

আমরা সক্রিয় মতাদর্শগত সংগ্রামের স্বপক্ষে, কারণ এটা হচ্ছে লড়াইয়ের স্বার্থে পার্টির ভেতরকার

ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভেতরকার ঐক্যকে নিশ্চিত করার হাতিয়ার। প্রত্যেক কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীর উচিত এই হাতিয়ার তুলে নেওয়া।

কিন্তু উদারতাবাদ মতাদর্শগত সংগ্রামকে বাতিল করে দেয় এবং নীতিহীন শান্তির পক্ষ নেয়, এইভাবে তা ক্ষয়িষ্ণু ও ইতর রীতিনীতির উদ্ভব ঘটায় এবং পার্টি ও বিপ্লবী সংগঠনগুলোর কোনো কোনো ইউনিট ও ব্যক্তির রাজনৈতিক অধঃপতন ঘটায়।

"উদারতাবাদের বিরোধিতা কর" (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

আত্মমুখীবাদ, সংকীর্ণতাবাদ ও পার্টির একঘেয়ে রচনার বিরোধিতা করার সময় আমাদের অবশ্যই দু'টি উদ্দেশ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে: প্রথমটা হচ্ছে "ভবিষ্যতের ভুল এড়াবার জন্য অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা", আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে "রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রোগ সারানো"। কারো মুখের দিকে না তাকিয়ে অতীতের ভুলগুলো

অবশ্যই প্রকাশ করে দিতে হবে; অতীতের খারাপ জিনিসকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা ও সমালোচনা করা প্রয়োজন, যাতে করে ভবিষ্যতের কাজ আরো সতর্কতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটাই হচ্ছে "ভবিষ্যতের ভুল এড়াবার জন্য অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা"-র অর্থ। কিন্তু আমাদের ভুল উদ্‌ঘাটন করার ও ত্রুটির সমালোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই চিকিৎসকের মত যিনি রোগীর চিকিৎসা করেন সম্পূর্ণভাবে রোগীকে বাঁচানোর জন্যই—তাকে মেরে ফেলার জন্য নয়। উপাঙ্গের প্রদাহ রোগে আক্রান্ত রোগীর উপাঙ্গটি চিকিৎসক যদি কেটে বাদ দেন তখনই রোগী বাঁচে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক ভুল ক'রে চিকিৎসার ভয়ে তার রোগ গোপন না রাখে, কিম্বা ভুল করতে করতে চিকিৎসার বাইরে চলে না যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সততা ও নিষ্ঠার সাথে রোগমুক্ত হতে চায় এবং ভুল শোধরাতে ইচ্ছুক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উচিত তাকে স্বাগত জানানো ও তার রোগ সারানো, যাতে সে একজন ভাল

কমরেড হয়ে উঠে। যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি এবং তার প্রতি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করি তা'হলে আমরা কখনো সফল হব না। মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক ব্যাধির চিকিৎসায় কখনো রুক্ষ ও বেপরোয়া মনোভাব গ্রহণ করা উচিত নয়, বরং "রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য রোগ সারানো"-র মনোভাব অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত; শুধু এটাই নির্ভুল ও ফলপ্রদ পদ্ধতি।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

পার্টির আভ্যন্তরীণ সমালোচনা প্রসঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, কোনো কোনো কমরেড সমালোচনা করার সময় বড় বড় বিষয়ের উপর মনোযোগ না দিয়ে কেবলমাত্র ছোটখাটো বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেন। তাঁরা বোঝেন না যে, সমালোচনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তি দেখিয়ে দে-ওয়া। ব্যক্তিগত ত্রুটির ব্যাপারে, যদি এই ত্রুটি

রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ভুল-ভ্রান্তির সঙ্গে জড়িত না হয়, তা'হলে ছিদ্রান্বেষী হবার কোনো দরকার নেই। অন্যথায়, কমরেডরা হতভম্ব হয়ে পড়বেন। অধিকন্তু, এ ধরনের সমালোচনা যদি একবার বিস্তার লাভ করে, তা'হলে পার্টির ভেতরে শুধু ছোটখাটো ত্রুটির উপরেই মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হবে এবং প্রত্যেকেই ভীরু ও অতি সাবধানী ভদ্র-লোক হয়ে পড়বেন, আর ভুলে যাবেন পার্টির রাজ-নৈতিক কর্তব্য। এটা খুবই বিপজ্জনক।

"পার্টির ভেতরকার ভুল চিন্তাধারা সংশোধন করা সম্পর্কে" (ডিসেম্বর, ১৯২৯)

পার্টির আভ্যন্তরীণ সমালোচনায় আত্মমুখিতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও সমালোচনার ইতরামির বিরুদ্ধে সতর্ক হতে হবে; কথা বলার সময় তথ্যভিত্তিক হতে হবে এবং সমালোচনায় রাজনৈতিক দিকের উপর জোর দিতে হবে।

ঐ

পার্টির আভ্যন্তরীণ সমালোচনা হচ্ছে পার্টির সংগঠনকে সুদৃঢ় করার ও পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বৃদ্ধি করার একটা হাতিয়ার। কিন্তু লাল ফৌজের পার্টি সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সমালোচনা যে সব সময়েই এই প্রকৃতির হয় তা নয়, কোনো কোনো সময় তা ব্যক্তিগত আক্রমণে পরিণত হয়। তার ফলে, ব্যক্তিবিশেষ ও পার্টি সংগঠন উভয়েরই ক্ষতি হয়। এটা হচ্ছে পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তি-তাবাদের অভিব্যক্তি। শুধরানোর পদ্ধতি হচ্ছে পার্টিসদস্যদের একথা বুঝতে সাহায্য করা যে, সমালোচনার উদ্দেশ্য হলো শ্রেণীসংগ্রামে জয়লা-ভের জন্য পার্টির সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো, এবং সমালোচনাকে ব্যক্তিগত আক্রমণের হাতিয়ার হিসে-বে ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঐ

আমরা জনগণের সেবা করি, তাই আমাদের যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তা'দেখিয়ে কোনো লোক আমাদের সমালোচনা করলে আমরা ভয় করি নে।

যিনিই হোন না কেন, সবাই আমাদের ত্রুটি দেখিয়ে দিতে পারেন। যদি তাঁর কথা ঠিক হয় তা'হলে আমরা নিজেদের ত্রুটি শুধরে নেবো। তিনি যা প্রস্তাব করেন তা'তে যদি জনগণের উপকার হয়, তবে আমরা তাঁর প্রস্তাব অনুসারেই কাজ করবো।

"জনগণের সেবা কর" (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪)

আমরা চীনা কমিউনিস্টরা ব্যাপকতম চীনা জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থের ভিত্তিতেই আমাদের সমস্ত কাজ ক'রে থাকি; আমাদের কার্য ন্যায়সঙ্গত বলে আমরা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, নিজেদের সব কিছু ত্যাগ করতে আমরা মোটেই পেছপাও হইনে, এবং নিজেদের কার্য সাধনের জন্য আমরা সব সময়েই প্রাণ বলিদানে প্রস্তুত থাকি। আমরা কি জনগণের প্রয়োজনের অনুপযোগী চিন্তাধারা, দৃষ্টিকোণ, মতামত বা পদ্ধতি ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হতে পারি? আমরা কি কোনো রাজনৈতিক ধূলো ও রাজনৈতিক জীবাণুকে আমাদের নির্মল মুখমণ্ডলকে নোংরা করতে অথবা আমাদের সুস্থ দেহে সংক্রমিত হতে দিতে ইচ্ছুক থাকতে পারি? অসংখ্য বিপ্লবী শহীদ জনগণের স্বার্থে তাঁদের প্রাণ বলি দিয়েছেন; তাঁদের কথা মনে পড়লেই আমাদের প্রতিটি জীবিত লোকের হৃদয় বেদনায় ভরে উঠে—তা'হলে এমন কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ কি থাকতে পারে যা আমরা বিসর্জন দিতে পারবো না? কিম্বা এমন কোনো ভুল কি থাকতে পারে যা আমরা পরিত্যাগ করতে পারবো না?

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

কোন রকম সাফল্যে আমাদের কখনো আত্মতৃপ্ত হলে চলবে না। আত্মতৃপ্তিকে আমাদের রোধ করতে হবে এবং প্রতিক্ষণেই নিজেদের ত্রুটির সমালোচনা করতে হবে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং ধূলো দূর করার জন্য আমরা রোজ মুখ ধুয়ে থাকি ও মেঝে ঝাড়ু দিয়ে থাকি।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

সমালোচনা যথাসময়ে করা উচিত, ঘটনা ঘটে যাবার পর সমালোচনা করার অভ্যাস থাকা উচিত নয়।

"কৃষি সমবায়ের সমস্যা সম্পর্কে"
(৩১শে জুলাই, ১৯৫৫)

ভুল-ভ্রান্তি ও বিপত্তির মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ ক'রে আমরা আরো বিজ্ঞ হয়েছি এবং আমাদের কাজ আরো ভালভাবে করছি। কোনো রাজনৈতিক পার্টি বা কোনো লোকের পক্ষে ভুল এড়িয়ে যাওয়া কঠিন, তবে আমাদের যথাসম্ভব কম ভুল করা উচিত। যখনি কোন ভুল করা হয় তখনি তা শুধরে নেওয়া উচিত, যত দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে তা শুধরানো যায় ততই ভাল।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

২৮. কমিউনিস্ট

একজন কমিউনিস্টের মুক্ত মনের অধিকারী, একনিষ্ঠ ও সক্রিয় হতে হবে, বিপ্লবের স্বার্থকে আপন প্রাণের মতো ক'রে দেখতে হবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিপ্লবের স্বার্থের অধীনে রাখতে হবে; তাঁকে সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রেই সঠিক নীতিতে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সমস্ত ভুল চিন্তাধারা ও আচর-ণের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করতে হবে, যাতে করে পার্টির যৌথ জীবনকে সুসংবদ্ধ এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যকার সংযোগকে জোরদার করা যায়; ব্যক্তি-বিশেষের চাইতে পার্টি ও জনসাধারণের সম্বন্ধে এবং নিজের চেয়ে অপরের সম্বন্ধে তাঁকে বেশী যত্নশীল হতে হবে। শুধু এমনি হলেই তাঁকে

একজন কমিউনিস্ট বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

"উদারতাবাদের বিরোধিতা কর" (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭)

প্রত্যেক কমরেডকে এটা অবশ্য বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, কমিউনিস্টের সমস্ত কথার ও কাজের চরম পরীক্ষা হচ্ছে সেগুলো ব্যাপকতম জনসাধারণের সর্বোচ্চ স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কি না এবং ব্যাপকতম জনসাধারণের সমর্থন পাচ্ছে কি না।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

কোনো সময়েই এবং কোনো পরিস্থিতিতেই একজন কমিউনিস্টের তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রথমে স্থান দেওয়া উচিত নয়, বরং তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতির ও জনসাধারণের স্বার্থের অধীনে রাখতে হবে। সেজন্য, স্বার্থপরতা, কাজে ঢিল দেওয়া, দুর্নীতিপরায়ণতা এবং আত্মপ্রচারে ব্রতী

হওয়া প্রভৃতি সবচেয়ে ঘৃণার্হ ; আর নিঃস্বার্থপরতা, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করা, গণকর্তব্যের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করা এবং নীরব ও কঠোর কাজই সম্মান লাভের যোগ্য।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

সত্যের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে কমিউনিস্টদেরকে অবশ্যই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ সত্যই জনগণের স্বার্থের স্বপক্ষে; কমিউনিস্টদেরকে অবশ্যই ভুল সংশোধন করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে, কারণ ভুলই জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে।

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

যে কোনো বিষয়েই কমিউনিস্টদের অবশ্যই কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হবে, নিজের মাথা খাটিয়ে বিস্তারিতভাবে ভাবতে হবে যে বিষয়টা

বাস্তবের সঙ্গে মিলছে কি না, তা' প্রকৃতই যুক্তিসঙ্গত কি না; অন্ধভাবে অনুসরণ করা ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিকে উৎসাহ দেওয়া কোনো মতেই উচিত নয়।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর" (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

কমরেডদেরকে সমগ্রের স্বার্থকে বিবেচনা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত। প্রতিটি পার্টিসদস্যকে, কাজের প্রতিটি শাখাকে এবং প্রতিটি কথা ও কাজকে অবশ্যই সমগ্র পার্টির স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে; এই নীতির লংঘন একেবারেই অনুমোদনযোগ্য নয়।

ঐ

কমিউনিস্টদের বাস্তবনিষ্ঠ ও দূরদর্শী হবার আদর্শস্থানীয় হতে হবে। কারণ কেবলমাত্র বাস্তবনিষ্ঠ হলেই নির্ধারিত কর্তব্য সম্পাদন করা যায় এবং দূরদর্শী হলেই কেবল অগ্রগতির দিশা হারায় না।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

কমিউনিস্টদের সবচেয়ে দূরদর্শী, সবচেয়ে আত্মত্যাগী, সবচেয়ে দৃঢ় হতে হবে, উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার ব্যাপারে সবচেয়ে সংস্কারমুক্ত হতে হবে, জনসাধারণের অধিকাংশের উপর নির্ভর করতে হবে এবং তাঁদের সমর্থন লাভ করতে হবে।

"জাপানবিরোধী যুদ্ধকালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য" (৩রা মে, ১৯৩৭)

অধ্যয়নেও কমিউনিস্টদেরকে আদর্শস্থানীয় হতে হবে, সর্বক্ষণই তাঁরা জনসাধারণের ছাত্র এবং শিক্ষক দুই-ই।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

গণ-আন্দোলনে কর্মরত প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই জনসাধারণের বন্ধু হতে হবে, তাঁদের উপরওয়ালা

নয়; তাঁদের অক্লান্ত শিক্ষক হতে হবে, আমলাতান্ত্রিক রাজনীতিজ্ঞ নয়।

ঐ

কমিউনিস্টদের কোনো মতেই জনসাধারণের সংখ্যাগুরু থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না, অধিকাংশ লোকের অবস্থা বিবেচনা না করে অল্পসংখ্যক ছোট ছোট প্রগতিশীল বাহিনীকে পরিচালিত ক'রে বিচ্ছিন্ন ও দুঃসাহসিকভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়; ব্যাপক জনসাধারণ ও প্রগতিশীল লোকজনদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। এটাই হচ্ছে সংখ্যাগুরুকে বিবেচনা করার দৃষ্টিকোণ।

ঐ

আমরা কমিউনিস্টরা হচ্ছি বীজের মতো, আর জনগণ হচ্ছেন জমির মতো। আমরা যেখানেই যাই না কেন সেখানকার জনগণের সঙ্গে আমাদের এক হতে হবে, জনগণের মধ্যে শিকড় গাড়তে এবং প্রস্ফুটিত হতে হবে।

"ছোংছিং আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে"
(১৭ই অক্টোবর, ১৯৪৫)

সকল বিষয়েই আমাদের কমিউনিস্টদের অবশ্যই জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হতে সক্ষম হ'তে হবে। যদি আমাদের পার্টিসদস্যরা সারা জীবন ঘরের ভেতরে বসে বসে কাটিয়ে দেন এবং ঝড়ঝাপ্টার মোকাবিলা করার জন্য ও দুনিয়ার মুখোমুখী হবার জন্য বাইরে না যান, তা'হলে এই ধরনের পার্টিসদস্যরা চীনা জনগণের কোন্ উপকারে আসবেন? কোনো উপকারেই আসবেন না। পার্টিসদস্য হিসেবে এ ধরনের লোকের আমাদের দরকার নেই। আমাদের কমিউনিস্টদের ঝড়ঝাপ্টার মোকাবিলা করতে হবে ও দুনিয়ার মুখোমুখী হতে হবে; এই ঝড়ঝাপ্টা হচ্ছে গণ-সংগ্রামের প্রবল

ঝড়ঝাপ্টা এবং এ দুনিয়া হচ্ছে গণ-সংগ্রামের মহান দুনিয়া।

"সংগঠিত হোন" (২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৩)

কমিউনিস্টদের আদর্শস্থানীয় অগ্রণীর ভূমিকা অপরিহার্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টম রুট বাহিনী ও নতুন চতুর্থ বাহিনীর কমিউনিস্টদের বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার, আদেশ পালন করার, শৃংখলা মেনে চলার, রাজনৈতিক কাজ করার এবং আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার ব্যাপারে আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠতে হবে।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

একজন কমিউনিস্টের কোনো ক্রমেই নিজেকে সব সময় ঠিক বলে মনে করা বা উদ্ধত হওয়া উচিত নয়, এমন মনে করা উচিত নয় যে সে নিজে সব কিছুতেই ভাল আর অন্যরা কোন কিছুতেই ভাল নয়; নিজেকে নিজের ছোট ঘরে বন্ধ করে রেখে আপন ঢাক আপনি বাজানো ও অন্যের উপরে মাতব্বরি করা তার কোনো মতেই চলবে না।

"সেনসী-কানসু-নিংসিয়া সীমান্ত এলাকার প্রতিনিধিদের সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (২১শে নভেম্বর, ১৯৪১)

কমিউনিস্টদের অবশ্যই পার্টি-বহির্ভূত লোকদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, এবং তাঁদের কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। তাঁরা যা বলেন তা যদি ঠিক হয় তা'হলে সেটাকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত এবং তাঁদের সদ্‌গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত; তাঁরা ভুল বললেও তাঁদেরকে শেষ পর্যন্ত বলতে দেওয়া উচিত এবং পরে ধৈর্যসহকারে তাঁদের কাছে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা উচিত।

ঐ

নিজেদের কাজে ভুল করেছেন এমন লোকদের মধ্যে যারা সংশোধনের অসাধ্য তারা ছাড়া অন্য

সকলের প্রতি কমিউনিস্টদের বুঝিয়ে বলার মনোভাব গ্রহণ করা উচিত; সরিয়ে রাখার নয়, যাতে তাঁরা নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারেন এবং পুরাতনকে ত্যাগ করে নতুনভাবে যাত্রা শুরু করতে পারেন।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

যাঁরা পশ্চাৎপদ তাঁদেরকে কমিউনিস্টদের তুচ্ছ করে দেখা কিংবা অবজ্ঞা করা উচিত নয়, বরং উচিত তাঁদের বন্ধু হওয়া, তাঁদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া, তাঁদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করা এবং অগ্রসর হবার জন্য তাঁদেরকে প্রেরণা দেওয়া।

ঐ

২৯. কেডার

আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের রঙ যাতে বদল না হয় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের যে শুধু সঠিক লাইন ও সঠিক কর্মনীতির প্রয়োজন তাই নয়, উপরন্তু সর্বহারা বিপ্লবের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন কোটি কোটি উত্তরসূরীকে অবশ্যই লালন-পালন ও প্রস্তুত ক'রে তুলতে হবে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের উত্তরসূরীদের লালনপালন করার সমস্যা হলো সর্বহারাশ্রেণীর প্রবীণ বিপ্লবীদের আরব্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী কার্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এমন লোক থাকবেন কি না, ভবিষ্যতে আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবীদের হাতে অব্যাহতভাবে থাকবে কি না,

আমাদের বংশধররা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নির্ভুল পথ ধ'রে অব্যাহতভাবে অগ্রসর হতে পারবেন কি না, বা, অন্য কথায়, আমরা চীনে খ্রুশ্চভসংশোধন-বাদের পুনঃআবির্ভাবকে সাফল্যের সঙ্গে ঠেকাতে পারবো কি না, তার সমস্যা। এক কথায়, এটা একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, আমাদের পার্টি ও আমাদের দেশের জীবনমরণের প্রশ্ন। আগামী এক শ' বছর, হাজার বছর, এমন কি দশ হাজার বছরের জন্য এটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের একটা মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সোভিয়েত ইউনিয়-নে সংঘটিত পরিবর্তনের উপরে ভিত্তি করে সাম্রাজ্য-বাদী ভবিষ্যদ্বক্তারা চীনা পার্টির তৃতীয় বা চতুর্থ বংশধরদের "শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের" উপর আশা রেখে বসে আছে। আমাদের অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদীদের এইসব ভবিষ্যদ্বাণীকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দিতে হবে। আমাদের অবশ্যই সর্বোচ্চ সংস্থা থেকে সর্বনিম্ন সংস্থা পর্যন্ত সর্বত্রই বিপ্লবী কার্যের উত্তরসূরী-দের লালনপালন ও প্রস্তুত করার দিকে অনবরত মনোযোগ দিতে হবে।

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের যোগ্য উত্তর-সূরী হবার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন?

তাঁদের অবশ্যই প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হতে হবে, খ্রুশ্চভের মতো মার্কসবাদ-লেনিন-বাদের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে সংশোধনবাদী হলে চলবে না।

তাঁদের অবশ্যই এমন বিপ্লবী হতে হবে যাঁরা মনেপ্রাণে চীনের ও বিশ্বের বিপুল সংখ্যাধিক জনগণের সেবা করেন, খ্রুশ্চভের মতো নিজের দেশের ভেতরে মুষ্টিমেয় বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত স্তরের স্বার্থের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থের সেবা করেন না।

তাঁদের অবশ্যই সর্বহারাশ্রেণীর এমন রাজ-নীতিজ্ঞ হতে হবে যাঁরা বিপুল সংখ্যাধিক লোকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একত্রে কাজ করতে সক্ষম। কেবলমাত্র যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত পোষণ করেন সেই সব লোকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হলেই চলবে না, বরং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেন সেই

সব লোকের সঙ্গে, এমন কি যাঁরা পূর্বে তাঁদের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বাস্তবে ভুল প্রমাণিত হয়েছেন এমন সব লোকের সঙ্গেও ঐক্যবদ্ধ হতে তাঁদের নিপুণ হতে হবে। কিন্তু খ্রুশ্চভের মতো মতলববাজ ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি অবশ্যই বিশেষ-ভাবে সতর্ক থাকতে হবে, এই ধরনের খারাপ লোক-কে পার্টির ও রাষ্ট্রের যে কোনো স্তরের নেতৃত্বকে কুক্ষিগত করতে বাধা দিতে হবে।

তাঁদের অবশ্যই পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার অনুসরণে আদর্শস্থানীয় হতে হবে, "জনসাধারণের কাছ থেকে নেওয়া এবং জনসাধারণকে দেওয়া"-র নীতিভিত্তিক নেতৃত্বের পদ্ধতিকে অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে এবং গণতান্ত্রিক কর্মরীতির চর্চা করতে হবে এবং জনসাধারণের মতামত শুনতে নিপুণ হতে হবে। খ্রুশ্চভের মতো পার্টির গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে লংঘন করা, স্বেচ্ছাচারী হওয়া, কমরেডদের উপর আকস্মিক হামলা চালানো, যুক্তি না মানা অথবা ব্যক্তিবিশেষের স্বৈরতন্ত্র চালু করা তাঁদের চলবে না।

তাঁদেরকে অবশ্যই বিনয়ী ও সতর্ক হতে হবে, অহঙ্কার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে, আত্মসমালোচনার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে, এবং নিজেদের কাজের ভুল-ত্রুটি শুধরানোর সাহস তাঁদের থাকতে হবে। তাঁদেরকে কোনো মতেই খ্রুশ্চভের মতো ভুল-ত্রুটিকে ঢেকে রাখা, সমস্ত কৃতিত্ব নিজেদের জন্য দাবি করা এবং সমস্ত দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না।

সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কার্যের উত্তরসূরীরা গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং বিপ্লবের প্রবল ঝড় ও তরঙ্গে পোড় খেয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেন। দীর্ঘকালীন গণ-সংগ্রামের মধ্যে কেডারদের যাচাই ও বিচার করা এবং উত্তরসূরীদের বাছাই ও শিক্ষিত ক'রে তোলা অপরিহার্য।

"খ্রুশ্চভের মেকী কমিউনিজম ও পৃথিবীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত (১৪ই জুলাই, ১৯৬৪)

আমাদের পার্টি-সংগঠনকে অবশ্যই সারা দেশে সম্প্রসারিত করতে হবে; আমাদের অবশ্যই হাজার হাজার কেডার ও শত শত প্রথম শ্রেণীর গণ-নেতাকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য তৈরী করে তুলতে হবে। এই কেডার ও নেতারা অবশ্যই মার্কসবাদ-লেনিনবাদে পারদর্শী, রাজনীতিতে দূরদর্শী, কর্মে দক্ষ, আত্মবলিদানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, স্বাধীনভাবে সমস্যা সমাধানে সক্ষম, বাধা-বিপত্তির মধ্যে স্থিরসংকল্পসম্পন্ন এবং জাতি, শ্রেণী ও পার্টির সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হবেন। পার্টি এই সব লোকের উপর নির্ভর করেই পার্টি-সদস্য ও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে এবং এই সব লোক জনসাধারণকে যে দৃঢ় নেতৃত্ব দেন তার উপর নির্ভর করেই পার্টি শত্রুকে পরাজিত করার লক্ষ্যে পৌঁছয়। এই ধরনের লোককে স্বার্থপরতা থেকে, ব্যক্তি-বীরত্ব ও হামবড়াভাব থেকে, কুঁড়েমি ও নিষ্ক্রিয়তা থেকে এবং উদ্ধত সংকীর্ণতাবাদ থেকে মুক্ত হতে হবে; তাঁদের অবশ্যই জাতীয় ও আপন শ্রেণীর নিঃস্বার্থ বীর

হতে হবে। এ হচ্ছে আমাদের পার্টির সদস্য, কেডার ও নেতাদের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ও কর্মরীতি।

"কোটি কোটি জনসাধারণকে জাপান-বিরোধী জাতীয় যুক্ত ফ্রণ্টে আনার জন্য সংগ্রাম কর" (৭ই মে, ১৯৩৭)

রাজনৈতিক লাইন নির্ধারিত হয়ে গেলে কেডার-গণই হচ্ছেন নির্ণায়ক উপাদান। তাই, পরিকল্পিত-ভাবে বিপুল সংখ্যক নতুন কেডারকে শিক্ষিত ক'রে তোলাই হলো আমাদের সংগ্রামী কর্তব্য।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

কমিউনিস্ট পার্টির কেডার-নীতিতে যে মানদণ্ড প্রয়োগ করা উচিত তা হচ্ছে কোন কেডার পার্টির লাইন দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন কি না, তিনি পার্টির শৃংখলা মানেন কি না, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে কি না, তিনি স্বাধীনভাবে

কাজ করতে সক্ষম কি না এবং তিনি সক্রিয়, পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থ কি না। এটাই হচ্ছে "কেবল যোগ্যতা অনুসারে লোক নিয়োগের" লাইন।

ঐ

যৌথ উৎপাদনের শ্রমে কেডারদের যোগদানের ব্যবস্থাটা অবশ্যই বজায় রাখতে হবে। আমাদের পার্টি ও রাষ্ট্রের কেডাররা হচ্ছেন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ, জনগণের মাথায় চ'ড়ে বসা লাটসাহেব নন। যৌথ উৎপাদনের শ্রমে যোগদান ক'রে কেডাররা শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে সবচেয়ে ব্যাপক, অবিরত ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখেন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটা হচ্ছে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ; এটা আমলাতন্ত্রবাদকে দূর করতে এবং সংশোধনবাদ ও গোঁড়ামিবাদকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

"খ্রুশ্চভের মেকী কমিউনিজম ও পৃথিবীর পক্ষে তার ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্পর্কে" শীর্ষক প্রবন্ধে উদ্ধৃত (১৪ই জুলাই, ১৯৬৪)

কেডারদের কিভাবে বিচার করতে হবে তা আমাদের অবশ্যই জানা দরকার। কেডারদের জীবনের কেবল অল্প সময়ের অবস্থা অথবা কেবল একটা মাত্র কাজের মধ্যেই বিবেচনা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, তাঁদের সমস্ত ইতিহাস ও সমস্ত কাজের বিবেচনা করতে হবে। এটাই হচ্ছে কেডারদের বিচার করার প্রধান পদ্ধতি।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

কি ক'রে কেডারদের ভালভাবে কাজে লাগান যায় তা আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, পরিচালকদের দায়িত্ব প্রধানতঃ দু'টি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট: অভিমত পেশ করা এবং কেডারদের ভালভাবে কাজে লাগানো। পরিকল্পনা খাড়া করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, এবং আদেশ ও নির্দেশ প্রদান সবকিছু "অভিমত পেশ করা"-র আওতায় পড়ে। এই সমস্ত অভিমত বাস্তবায়িত করার জন্য

অবশ্যই কেডারদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এবং তাঁদেরকে কাজে উৎসাহিত করতে হবে; এটা "কেডারদের ভালভাবে কাজে লাগানো"-র আওতায় পড়ে।

ঐ

আমাদের অবশ্যই কেডারদের ভালোভাবে যত্ন নিতে নিপুণ হতে হবে। যত্ন নেবার পদ্ধতি হচ্ছে : প্রথম, তাঁদের পথনির্দেশ করা। এর অর্থ, তাঁদের অবাধে কাজ করতে দেওয়া যাতে করে তাঁরা সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন; একই সময়ে তাঁদের সময়োচিত নির্দেশও দেওয়া যাতে করে পার্টির রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে তাঁরা নিজেদের সৃজনশীল উদ্যোগকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারেন। দ্বিতীয়, তাঁদের মান উন্নত করা। এর অর্থ, অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়ে তাঁদের শিক্ষাদান করা, যাতে করে তাঁরা তাঁদের তত্ত্বগত উপলব্ধি এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারেন।

তৃতীয়, তাঁদের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখা এবং তাঁদের অভিজ্ঞতার সারসংকলনে, তাঁদের সাফল্যকে সামনে এগিয়ে নিতে ও ভুলগুলোকে শুধরে নিতে তাঁদেরকে সাহায্য করা। পরীক্ষা ছাড়া কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া এবং শুধু মারাত্মক ভুল করা হলেই কেবল তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা কেডারদের প্রতি যত্ন নেবার পদ্ধতি নয়। চতুর্থ, যে সব কেডার-রা ভুল করেছেন তাঁদের প্রতি সাধারণতঃ বুঝিয়ে বলার পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, এবং তাঁদের ভুল শুধরাতে সাহায্য করতে হবে। গুরুতর ভুল করেও যারা নির্দেশ মানতে অস্বীকার করে, কেবলমাত্র তাদের বেলায় সংগ্রামের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ধৈর্য ধারণ করা এসব ক্ষেত্রে অপরিহার্য; কোনো লোককে লঘুভাবে "সুবিধাবাদী" লেবেল এঁটে দেওয়া অথবা লঘুভাবে তাঁর বিরুদ্ধে "সংগ্রাম চালনার" পদ্ধতি অবলম্বন করা ঠিক নয়। পঞ্চম, তাঁদের অসুবিধার সময়ে তাঁদের সাহায্য করা। কেডাররা রোগ, অর্থাভাবজনিত বা পারিবারিক ও

অন্যান্য কষ্টের ফলে অসুবিধায় পড়লে তাঁদের প্রতি যতটা সম্ভব মনোযোগের সঙ্গে অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। এগুলোই হচ্ছে কেডারদের ভালোভাবে যত্ন নেবার পদ্ধতি।

ঐ

প্রকৃতই ঐক্যবদ্ধ ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত একটা নেতৃগোষ্ঠী কেবলমাত্র গণ-সংগ্রামের মধ্যে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে পারে—তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, একটা মহান সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে, তার সমগ্র কাল ধরে অর্থাৎ তার প্রাথমিক, মধ্য ও শেষ পর্যায় অবধি সবসময় ধ'রে নেতৃগোষ্ঠী সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তিত থাকা উচিত নয় এবং তা থাকতেও পারে না; সংগ্রাম চলাকালে যে সব সক্রিয় ব্যক্তিরা সামনের কাতারে চলে আসেন, তাঁদের অবশ্যই অনবরত উচ্চস্তরে উন্নীত করতে হবে এবং পূর্ববর্তী নেতৃগোষ্ঠীতে যাঁরা তুলনামূলক-

ভাবে নিম্নমানের অথবা অধঃপতিত, সে সব সদস্য-দের বদলে তাঁদের গ্রহণ করতে হবে।

"নেতৃত্বের পদ্ধতি সম্পর্কে কতিপয় সমস্যা" (১লা জুন, ১৯৪৩)

যদি আমাদের পার্টিতে এমন অনেক বেশীসংখ্যক নতুন কেডার না থাকেন যাঁরা পুরানো কেডার-দের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করেন, তা'হলে আমাদের কার্য মাঝপথে গতিরুদ্ধ হয়ে পড়বে। সেজন্য সমস্ত পুরানো কেডার-দেরকে পরম উৎসাহের সঙ্গে নতুন কেডারদের স্বাগত জানাতে হবে, তাঁদের প্রতি পরম যত্ন নিতে হবে। সত্য বটে, নতুন কেডারদের ত্রুটি আছে, বিপ্লবে তাঁরা যোগ দিয়েছেন বেশী দিন হয় নি; তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাব আছে এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অপরিহার্যভাবেই পুরানো সমাজের অস্বাস্থ্যকর মতাদর্শের ধ্বংসাবশেষ সঙ্গে ক'রে এনেছেন, যা হ'ল পাতি বুর্জোয়াশ্রেণীর ব্যক্তিতাবাদী চিন্তা-ধারার অবশেষ। কিন্তু শিক্ষা আর বিপ্লবের অগ্নি-

পরীক্ষার ভেতর দিয়ে এই সব ত্রুটি ক্রমে ক্রমে দূর করা যেতে পারে। স্তালিন যেমন বলেছেন তেমনি তাঁদের সদ্‌গুণ হচ্ছে—যা কিছু নতুন সেসব বিষয়ের প্রতি তাঁরা তীব্রভাবে সংবেদনশীল; তাই তাঁরা অত্যন্ত বেশী উদ্যমশীল ও সক্রিয়, ঠিক যেসব গুণের অভাব কোনো কোনো পুরোনো কেডারদের থাকে। নতুন ও পুরানো কেডারদের পরস্পরকে সম্মান করা, পরস্পরের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা, এবং পরস্পরের সদ্‌গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে নিজের ত্রুটি দূর করা উচিত, যাতে করে তাঁরা সম্পূর্ণ এক হয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারেন এবং সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁককে ঠেকাতে পারেন।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর"
(১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

শুধুমাত্র পার্টি-কেডারদের নয়, পার্টি-বহির্ভূত কেডারদেরও আমাদের যত্ন নিতে হবে। পার্টির বাইরে অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন, তাঁদেরকে আমাদের উপেক্ষা করা চলবে না। প্রত্যেক কমিউ-নিস্টের কর্তব্য হলো অহমিকা ও একাকীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা, পার্টি-বহির্ভূত কেডারদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে নিপুণ হওয়া, তাঁদেরকে আন্তরিক সাহায্য দেওয়া, একটা ঐকান্তিক কমরেডসুলভ মনোভাব নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার করা এবং তাঁদের সক্রিয়তাকে জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ও দেশ গঠনের মহান কার্যে নিয়োজিত করা।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

৩০. তরুণ সম্প্রদায়

পৃথিবীটা তোমাদের এবং আমাদেরও, কিন্তু চূড়ান্ত বিশ্লেষণে এটা তোমাদেরই। তোমরা তরু-ণেরা, সজীব ও প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, তোমরা রয়েছ জীবনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, সকাল আট-ন'টার সময়কার সূর্যের মতো। তোমাদের উপরেই আমরা আশা রাখি।

....

পৃথিবীটা তোমাদেরই। চীনের ভবিষ্যৎও তোমা-দের।

মস্কোতে চীনা ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানবীশ-দের সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৫৭)

সমস্ত তরুণদের এ কথা বুঝতে আমাদের অবশ্যই সাহায্য করতে হবে যে, আমাদের দেশ এখনো অত্যন্ত গরীব এবং অল্প সময়ের মধ্যে এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন অসম্ভব, একমাত্র তরুণদের এবং সমস্ত জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও তাঁদের স্বহস্তের কাজই কয়েক দশকের মধ্যে চীনকে সমৃদ্ধ ও শক্তি-শালী ক'রে তুলতে পারে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যতের আদর্শসমাজ ব্যবস্থায় পৌঁছা-নোর জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতের আদর্শসমাজ ব্যবস্থাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

বেশ কিছু সংখ্যক তরুণ তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে পুরানো ও নয়া চীনের মধ্যে তুলনা করতে সক্ষম নয়;

সাম্রাজ্যবাদী ও কুওমিনতাঙ প্রতিক্রিয়াশীলদের অত্যাচার থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য আমাদের জনগণকে যে কত কঠিন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল, কিম্বা একটা সুষ্ঠু সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে কত দীর্ঘকালের কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। কাজেই, জনসাধারণের মধ্যে সজীব ও কার্যকরী রাজনৈতিক শিক্ষা অবিরামভাবে আমাদের চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং যেসব বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হয় সেগুলির সত্যরূপ তাদের কাছে সবসময়েই ব্যাখ্যা করতে হবে, আর কি করে এসব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করা যায় সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

ঐ

তরুণরাই হচ্ছে গোটা সমাজের সবচেয়ে সক্রিয় আর সবচেয়ে সজীব শক্তি। শিক্ষা গ্রহণে তারা সবচেয়ে বেশী আগ্রহশীল আর তাদের চিন্তাধারা সবচেয়ে কম রক্ষণশীল। সমাজতান্ত্রিক যুগে এ কথাটা বিশেষভাবে সত্য। আমরা আশা করি, বিভিন্ন স্থানের পার্টি-সংগঠনগুলো স্থানীয় যুবলীগ সংগঠনগুলিকে সাহায্য করবে, সেগুলির সঙ্গে মিলে কাজ করবে এবং কেমনভাবে বিশেষ করে আমাদের যুব-শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়, সে প্রশ্নটিকে বিচার করার প্রতি মনোযোগ দেবে। তাদের সঙ্গে অন্যসব লোকের মতো করে আচরণ করা কিংবা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। অবশ্যই, বৃদ্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের কাছ থেকে তরুণদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, এবং তরুণদের উচিত তাঁদের সম্মতিসাপেক্ষে সবরকম হিতকর কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালান।

"চোংশান জেলার সিনপিং থানার নবম কৃষি উৎপাদন সমবায়সমিতির যুব-অগ্রণী-দল"-এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

একজন তরুণ বিপ্লবী কি না তা বিচার করতে কি মানদণ্ড ব্যবহার করা উচিত? কেমন করে

তা আমরা বলতে পারি? কেবল একটা মাত্র মানদণ্ড আছে, তা হচ্ছে সে নিজেকে ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক-সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক কি না এবং বাস্তবে তা করছে কি না। যদি সে এমন করতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে মিশে যায় তা'হলে সে একজন বিপ্লবী; অন্যথায়, হয় সে একজন অবিপ্লবী নয়তো প্রতি-বিপ্লবী। যদি আজ সে নিজেকে শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে, তা'হলে আজ সে একজন বিপ্লবী; কিন্তু আগামী কাল যদি সে তাঁদের সঙ্গে না মিশে অথবা উল্টো সাধারণ জনগণের উপর অত্যাচার করে, তা'হলে সে হয়ে পড়বে অবিপ্লবী বা প্রতিবিপ্লবী।

"যুব আন্দোলনের দিশা" (৪ঠা মে, ১৯৩৯)

জনসাধারণের বিপ্লবী সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে ঝাঁপিয়ে না পড়া, অথবা জনসাধারণের স্বার্থের সেবা করতে এবং তাঁদের সঙ্গে মিশে যেতে মনস্থির না করা পর্যন্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়শঃই আত্মমুখীবাদী ও ব্যক্তিতাবাদী হবার প্রবণতা দেখায়; তখন তাদের চিন্তাধারা প্রায়ই হয়ে থাকে বাস্তব-বিমুখ এবং তাদের কার্যকলাপও হয়ে থাকে দ্বিধাগ্রস্ত। তাই চীনের ব্যাপক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যদিও অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করতে পারে এবং জনসাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করতে পারে, তবুও এই সব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সবাই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী থাকবে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিপ্লবের জরুরী মুহূর্তে বিপ্লবী বাহিনী থেকে সরে পড়তে পারে এবং নিষ্ক্রিয় মনোভাব গ্রহণ করতে পারে; আবার কিছু সংখ্যক লোক বিপ্লবের শত্রুতে পরিণত হতে পারে। কেবলমাত্র দীর্ঘকালীন গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বুদ্ধিজীবীরা এই ত্রুটি স্খালন করতে পারে।

"চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি" (ডিসেম্বর, ১৯৩৯)

পার্টির কেন্দ্রীয় কর্তব্যকর্মে যুব-লীগকে পার্টির সঙ্গে সমন্বয় রেখে অব্যাহতভাবে কাজ ক'রে যেতে হবে; তা ছাড়াও তরুণদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপযোগী নিজস্ব কাজও তাকে করতে হবে। নয়া চীনকে তার তরুণদের জন্য ভাবতে হবে এবং তরুণদের উন্নতির জন্য যত্ন নিতে হবে। তরুণদের পড়াশুনা ও কাজ করতে হবে, কিন্তু তাদের বয়সটা হলো তাদের শারীরিক পরিপুষ্টির বয়স। কাজেই, এক দিকে তাদের কাজ ও পড়াশুনা এবং অপর দিকে তাদের আমোদ-প্রমোদ, খেলাধূলা ও বিশ্রাম এই উভয় দিকে অবশ্যই পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে।

যুব-লীগের দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীকে সাক্ষাৎদানকালে প্রদত্ত ভাষণ (৩০শে জুন, ১৯৫৩)

৩১. নারী

চীনের পুরুষেরা সাধারণতঃ তিন ধরনের কর্তৃত্বের [রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মগত কর্তৃত্ব (সম্পাদক)] ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত, ... নারীরা উপরোক্ত তিন ধরনের কর্তৃত্বের দ্বারা শাসিতা হওয়া ছাড়াও, তাঁরা পুরুষদের দ্বারা শাসিতা (স্বামীর কর্তৃত্ব)। এই চারটি কর্তৃত্ব—রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মগত কর্তৃত্ব ও স্বামীর কর্তৃত্ব—সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃ-প্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থার মূর্ত প্রকাশ; আর এগুলোই হচ্ছে চারটা মস্ত মোটা দড়ি যা চীনা জনগণকে, বিশেষ করে কৃষকদের বেঁধে রেখেছে। কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে কেমন করে জমিদারদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ করেছেন

তা উপরে বর্ণিত হয়েছে। জমিদারদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হচ্ছে অন্য সমস্ত কর্তৃত্বের মেরুদণ্ড। জমিদারদের সেই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মগত কর্তৃত্ব ও স্বামীর কর্তৃত্ব সবই টলায়মান হয়ে পড়ে। ...... স্বামীর কর্তৃত্ব গরীব কৃষকদের মধ্যে সবসময় দুর্বলতর, কারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজনে গরীব কৃষকনারীরা ধনী শ্রেণীর নারীদের চেয়ে বেশী কায়িক শ্রম না করে পারেন না, তাই পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলার অধিকার, এমন কি সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তাঁদের অপেক্ষাকৃত বেশী। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গ্রামাঞ্চলের অর্থনীতির দেউলেপনা বেড়ে উঠতে থাকায় নারীদের উপর পুরুষদের নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছে। কৃষক আন্দোলনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক জায়গায় নারীরা বর্তমানে পল্লী-নারী সমিতি গঠন করতে শুরু করেছেন, নারীদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সুযোগ এসেছে এবং স্বামীর কর্তৃত্ব দিন দিন আরো বেশী নড়বড়ে হয়ে পড়ছে। এক কথায়, কৃষকদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃ-প্রধান মতাদর্শ ও ব্যবস্থা টলমল করছে।

"হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট" (মার্চ, ১৯২৭)

নারীদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হোন এবং উৎপাদন ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করুন।

"নয়া চীনের নারী" পত্রিকার জন্য অভিলেখন (২০শে জুলাই, ১৯৪৯)

তরুণসম্প্রদায়, মহিলা ও শিশুদের স্বার্থ রক্ষা করুন, পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে না এমন তরুণ ছাত্রদের সাহায্য করুন, জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধ ও সামাজিক প্রগতির জন্য হিতকর বিভিন্ন কাজে সমানাধিকারের ভিত্তিতে যোগদানের জন্য

তরুণ ও মহিলাদের সংগঠিত হতে সাহায্য করুন, বিবাহের স্বাধীনতা এবং নারী পুরুষের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করুন এবং তরুণ ও শিশুদের হিতকর শিক্ষা দিন; . . . . . .

"সম্মিলিত সরকার সম্পর্কে" (২৪শে এপ্রিল, ১৯৪৫)

সংগঠিতভাবে শ্রমশক্তিকে বিন্যস্ত করা এবং উৎপাদনের কাজে যোগদানের জন্য মহিলাদেরকে উৎসাহদান করাই হলো আমাদের কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রের মৌলিক কর্তব্য।

"আমাদের অর্থনৈতিক কর্মনীতি" (২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪)

একটা মহান সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য উৎপাদনের কাজে যোগদান করতে ব্যাপক নারী-সাধারণকে জাগ্রত করার গুরুত্বটা খুবই বিরাট। উৎপাদনে পুরুষ ও নারীর সমান কাজের জন্য সমান সমান বেতন দিতে হবে। কেবলমাত্র সমগ্র

সমাজের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই নারী ও পুরুষের মধ্যে সত্যিকারের সমানাধিকার হাসিল করা যায়।

"নারীরা শ্রম-ফ্রণ্টে গমন করেছেন" -এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

কৃষি-সমবায়ীকরণ সম্পন্ন করার পর বহু সমবায়-সমিতি শ্রমশক্তির অভাব বোধ করছে। যে ব্যাপক নারীসাধারণ আগে মাঠে কাজ করেন নি তাঁদেরকে শ্রম-ফ্রণ্টে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। . . . . . . চীনের নারীরা হচ্ছেন শ্রম-শক্তির একটা বিরাট উৎস। একটা মহান সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার সংগ্রামে এই উৎসকে কাজে লাগাতে হবে।

"উৎপাদনে যোগদানের জন্য নারীদের উদ্বুদ্ধ করে শ্রমশক্তির অভাবের সমাধান করা" -এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

প্রত্যেক কর্মক্ষম নারী যাতে সমান শ্রমের জন্য সমান সমান বেতনের নীতির ভিত্তিতে শ্রম-ফ্রণ্টে যোগদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করুন। কাজটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সম্পন্ন করে ফেলা উচিত।

"কৃষি-সমবায়ীকরণ আন্দোলনে নারীদের কাজের পরিধি সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা সম্পর্কে সিংথাই জেলার গণতান্ত্রিক নারী সমিতি" -এর ভূমিকালিপি (১৯৫৫)

৩২. সংস্কৃতি ও শিল্পকলা

বর্তমান দুনিয়ায় সমস্ত সংস্কৃতি, সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পকলা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অধিকারে রয়েছে, এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। শিল্পকলার খাতিরেই শিল্পকলা, শ্রেণীর উর্ধ্বে শিল্পকলা এবং রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং রাজনীতি নিরপেক্ষ শিল্পকলার বাস্তবে কোনো অস্তিত্বই নেই। সর্বহারাশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে সর্বহারাশ্রেণীর সমগ্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের একটা অংশ; সেগুলি হচ্ছে, লেনিন যেমন বলেছেন, সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের "দাঁতওয়ালা চাকা ও ইস্ক্রুপ"।

"সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

বিপ্লবী সংস্কৃতি হলো, ব্যাপক জনসাধারণের জন্য বিপ্লবের বলিষ্ঠ অস্ত্র। বিপ্লবের পূর্বে তা মতাদর্শগতভাবে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে; বিপ্লবের সময়ে তা হলো বিপ্লবের সাধারণ ফ্রণ্টের মধ্যে একটা অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামী ফ্রণ্ট।

"নয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে" (জানুয়ারী, ১৯৪০)

আমাদের সকল সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে ব্যাপক জনগণের জন্য, প্রথমতঃ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্য; শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্যই এগুলো রচিত হয় এবং তাঁরাই এগুলো ব্যবহার করেন।

"সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ" (মে, ১৯৪২)

আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার কর্মীদের অবশ্যই এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে এবং নিজেদের

অবস্থানের পরিবর্তন সাধন করতে হবে; শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া ও বাস্তব সংগ্রামের গভীরে যাবার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এবং মার্কসবাদ ও সমাজকে অধ্যয়ন করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁদের অবশ্যই ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসতে হবে এবং এসে দাঁড়াতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের পক্ষে, সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে। শুধুমাত্র এইভাবেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্য সত্যিকারের সাহিত্য ও শিল্পকলা, সর্বহারাশ্রেণীর একটি সত্যিকারের সাহিত্য ও শিল্পকলা।

ঐ

আমাদের উদ্দেশ্য হলো এটা নিশ্চিত করা যে, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমগ্র বিপ্লবী যন্ত্রের একটা যথাযোগ্য অঙ্গীভূত অংশ হিসেবে ভালোভাবে গড়ে উঠুক; নিশ্চিত করা যে, সেগুলো জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও শিক্ষিত করে তোলার এবং শত্রুকে আক্রমণ ও ধ্বংস করার বলিষ্ঠ হাতিয়ার হিসেবে কাজ

করুক, এবং নিশ্চিত করা যে, সেগুলো একমনে একপ্রাণে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে জনগণকে সাহায্য করুক।

ঐ

সাহিত্য ও শিল্পকলার সমালোচনার দু'টি মানদণ্ড আছে—একটা রাজনৈতিক মানদণ্ড, অন্যটা শিল্পগত মানদণ্ড। . . . . . .

রাজনৈতিক মানদণ্ড আছে, আবার শিল্পগত মানদণ্ডও আছে; এ দু'টির মধ্যকার সম্পর্ক কি? রাজনীতি শিল্পকলার সমতুল্য নয়, সাধারণ বিশ্বদৃষ্টি-কোণও শিল্পকলার সৃষ্টি ও সমালোচনার পদ্ধতির সমতুল্য নয়। আমরা বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরি-বর্তনীয় রাজনৈতিক মানদণ্ডকে যেমন অস্বীকার করি, তেমনি বিমূর্ত ও সম্পূর্ণরূপে অপরিবর্তনীয় শিল্পগত মানদণ্ডকেও অস্বীকার করি; প্রত্যেকটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক ও শিল্পগত মানদণ্ড আছে। কিন্তু যে কোনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজের যে কোনো শ্রেণীই

সর্বদা রাজনৈতিক মানদণ্ডকে প্রথমে স্থান দিয়ে থাকে এবং শিল্পগত মানদণ্ডকে স্থান দেয় তার পরে। . . . . . . আমাদের দাবি হচ্ছে রাজনীতি ও শিল্পকলার একত্ব, অন্তর্বস্তু ও রূপের একত্ব, বিপ্লবী রাজনৈতিক অন্তর্বস্তু ও যথাসম্ভব নিখুঁত শিল্পরূপের একত্ব। শিল্পকর্ম রাজনৈতিক দিক থেকে যতই প্রগতিশীল হোক না কেন তাতে শিল্পগত গুণাবলীর অভাব থাকলে তা শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অতএব, আমরা যেমন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে ভুল এমন শিল্পকর্মের বিরোধিতা করি, তেমনি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের দিক থেকে নির্ভুল কিন্তু শিল্পকর্মে শক্তিহীন এমন "প্রচারপত্র ও শ্লোগান সর্বস্ব রীতির" প্রতি ঝোঁকেরও বিরোধিতা করি। সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রশ্নে আমাদের অবশ্যই দুই ফ্রণ্টেই সংগ্রাম চালাতে হবে।

ঐ

"শত ফুল ফুটুক ও শত রকমের মতবাদ পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুক"—এই নীতি হচ্ছে

শিল্পকলার বিকাশ ও বিজ্ঞানের প্রগতিকে এগিয়ে নেবার কর্মনীতি এবং আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে উন্নতিশীল করার কর্মনীতি। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও শৈলীর স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করা উচিত এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতা করা উচিত। আমরা মনে করি, একটা বিশেষ শিল্পশৈলী বা মতবাদকে চাপিয়ে দেবার এবং অন্য শৈলী বা মতবাদকে নিষিদ্ধ করার জন্য যদি প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তা'হলে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিকাশের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল বা নির্ভুল সম্পর্কিত তর্কের মীমাংসা করতে হবে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর অবাধ আলোচনার মাধ্যমে এবং এই সব বিষয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে। সংক্ষেপে সেগুলির সমাধান করা চলবে না।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

সংস্কৃতিবিহীন সৈন্যবাহিনী হচ্ছে ভোঁতাবুদ্ধি-সম্পন্ন সৈন্যবাহিনী; আর ভোঁতাবুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্য-বাহিনী শত্রুকে পরাজিত করতে পারে না।

"সাংস্কৃতিক কর্মে যুক্ত ফ্রণ্ট" (৩০শে অক্টোবর, ১৯৪৪)

৩৩. অধ্যয়ন

অনগ্রসর কৃষিপ্রধান চীনকে একটা অগ্রসর শিল্পপ্রধান চীনে পরিবর্তিত করার জন্য আমাদের অত্যন্ত কঠোর কাজের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, এবং আমাদের অভিজ্ঞতাও মোটেই যথেষ্ট নয়। সেজন্য আমাদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণে নিপুণ হতে হবে।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ" (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)

অবস্থা নিরন্তরই পরিবর্তিত হচ্ছে, তাই নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজের চিন্তাধারাকে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রত্যেককে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে। এমন কি মার্কসবাদ সম্বন্ধে যাঁরা অপেক্ষাকৃত বেশী

জানেন এবং যাঁরা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভাবে সর্বহারা-শ্রেণীর সপক্ষে দাঁড়ান তাঁদেরও আরো অধ্যয়ন করতে হবে, যা নতুন তা গ্রহণ করতে হবে এবং নতুন সমস্যার পর্যালোচনা করতে হবে।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

আমরা যা জানি না তা শিখে নিতে পারি। আমরা যে শুধু পুরাতন দুনিয়া ধ্বংস করতেই নিপুণ তাই নয়, আমরা নূতন দুনিয়া গ'ড়ে তুলতেও নিপুণ।

"চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণাংগ অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্ট" (৫ই মার্চ, ১৯৪৯)

অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে দু' রকমের মনোভাব রয়েছে। একটা হলো গোঁড়া-মিবাদের মনোভাব, অর্থাৎ আমাদের দেশের অবস্থার

উপযোগী হোক বা না হোক, সব কিছুকেই নিয়ে এসে হুবহু প্রয়োগ করার মনোভাব। এ ধরনের মনোভাব ভাল নয়। আর একটা মনোভাব হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের সময় মাথা খাটিয়ে ভেবে আমাদের দেশের অবস্থার উপযোগী জিনিস শিখে নেওয়ার মনোভাব, অর্থাৎ যে সব অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে হিতকর সেগুলো গ্রহণ করার মনোভাব; এই ধরনের মনোভাব গ্রহণ করাই আমাদের দরকার।

"জনগণের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঠিক মীমাংসার সমস্যা সম্পর্কে" (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিনের তত্ত্ব সর্বত্রই প্রযোজ্য। একে যুক্তির অতীত কোন তত্ত্ব ব'লে মনে করা উচিত নয়, বরং এটাকে কার্যকলাপের পথনির্দেশক ব'লে মনে করা উচিত। এটা অধ্যয়ন করা কেবল কতকগুলি পদ বা শব্দসমষ্টি শেখার ব্যাপার নয়, বরং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিপ্লবের বিজ্ঞান হিসাবে শেখা। বাস্তব জীবন ও বিপ্লবী

অভিজ্ঞতার উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্তালিন সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেগুলিকে কেবল বোঝা-বার ব্যাপার এটা নয়, বরং তা সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও সমাধানে তাঁদের অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি-কেও শেখা।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

যদি একটা নির্ভুল তত্ত্ব থাকে, কিন্তু যদি তা নিয়ে শুধু বকবকই করা হয়, যদি তাকে খোপের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় এবং কাজে লাগান না হয়, তা'হলে সেই তত্ত্বটি যত ভালই হোক না কেন, তার কোনো তাৎপর্যই থাকে না।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

মার্কসবাদী তত্ত্বকে গভীরভাবে আয়ত্ত করা ও তার প্রয়োগ করা উচিত; তাকে গভীরভাবে আয়ত্ত করার একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকে প্রয়োগ করা।

যদি আপনি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বা দু'টি বাস্তব সমস্যার ব্যাখ্যা করতে পারেন, তা'হলে আপনি প্রশংসা পাবার যোগ্য এবং আপনি কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন বলে মনে করা যায়। যত বেশী, ব্যাপক ও গভীরভাবে আপনি তা করবেন, আপনার সাফল্য ততই বৃহত্তর হয়ে উঠবে।

"পার্টির কর্মরীতির সংশোধন কর"
(১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২)

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব ও চীন বিপ্লবের বাস্তব কর্মকাণ্ড কিভাবে পরস্পর সংযুক্ত? সাধারণ ভাষায় বলা যায়, "লক্ষ্যবস্তুতে তীর নিক্ষেপ" -এর মতো এই সংযোগ। লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে তীরের যে সম্পর্ক চীন বিপ্লবের সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সেই সম্পর্ক। কোনো কোনো কমরেড কিন্তু "লক্ষ্যহীনভাবেই তীর ছোড়েন", এলোপাতাড়ি তীর ছোড়েন, এবং এই

ধরনের লোক সহজেই বিপ্লবের ক্ষতি করতে পারেন।

ঐ

কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ, তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের অধ্যয়ন করতে হবে এবং গুরুত্ব সহকারে পড়াশুনা করতেই হবে; শুধুমাত্র তা'হলেই তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে সুব্যবস্থিত করতে ও তার সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন এবং তাকে তত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে সমর্থ হবেন; শুধুমাত্র তখনই তাঁরা তাঁদের আংশিক অভিজ্ঞতাকে সর্বজনীন সত্য বলে ভুল করবেন না এবং অভিজ্ঞতাবাদের ভুল এড়িয়ে যেতে পারবেন।

ঐ

পড়াশুনা করা হচ্ছে শিক্ষা লাভ করা, কিন্তু প্রয়োগ করাও শিক্ষা লাভ করা, আর এটাই হচ্ছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যুদ্ধ করার মাধ্যমে যুদ্ধ শিক্ষা করা—এটাই আমাদের প্রধান পদ্ধতি। যার স্কুলে যাবার সুযোগ হয় নি সেও যুদ্ধ শিখতে পারে, সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শিখতে পারে।

বিপ্লবী যুদ্ধ হচ্ছে জনসাধারণের কাজ; এতে প্রায়শঃই প্রথমে শিখে পরে কাজ করা নয়, বরং কাজ ক'রে শেখা, কারণ কাজ করা মানেই শিক্ষালাভ করা।

"চীনের বিপ্লবী যুদ্ধের রণনীতির সমস্যা"
(ডিসেম্বর, ১৯৩৬)

"সাধারণ অসামরিক ব্যক্তি" ও সৈন্যের মধ্যে একটা ব্যবধান আছে, কিন্তু এটা মহাপ্রাচীর নয়; এই ব্যবধানটাকে দ্রুত দূর করা যায়, আর এটা দূর করার পদ্ধতি হচ্ছে বিপ্লবে ও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। যখন আমরা বলি শিক্ষা লাভ করা ও প্রয়োগ করা সহজ নয় তখন আমরা বোঝাই যে, সম্পূর্ণরূপে শেখা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা কঠিন। যখন আমরা বলি "সাধারণ অসামরিক ব্যক্তি" দ্রুত সৈন্যে পরিবর্তিত হতে পারেন তখন আমরা বোঝাই যে, প্রবেশ দ্বার অতিক্রম করা কঠিন নয়। এই দুইটি বক্তব্যকে একত্রে একটা চীনা পুরানো প্রবাদ বাক্যে প্রকাশ করা যায়; সেটা হলো "কার্য সাধনে যারা দৃঢ়সংকল্প, তাদের পক্ষে দুনিয়ায় কঠিন বলে কিছুই নেই।" প্রবেশ দ্বার

অতিক্রম করা কঠিন নয়, নৈপুণ্য অর্জনও সম্ভব, কেবলমাত্র যদি কর্তব্যসাধনে মন লাগান যায় এবং শিক্ষা গ্রহণে নিপুণ হওয়া যায়।

ঐ

সকল বিজ্ঞ লোকের (তাঁরা যে কেউই হোন না কেন) কাছ থেকেই আমাদের অবশ্য অর্থনৈতিক কাজকর্ম শিখতে হবে। শিক্ষক হিসেবে তাঁদেরকে আমাদের অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে, সম্ভ্রমের সঙ্গে ও বিবেকবুদ্ধি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে শিখতে হবে। না জেনে আমাদের জানার ভান করা চলবে না।

"জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব সম্পর্কে" (৩০শে জুন, ১৯৪৯)

জ্ঞান হচ্ছে একটা বিজ্ঞানের ব্যাপার, বিন্দুমাত্রও কপটতা কিংবা অহমিকা এই ক্ষেত্রে অনুমোদন যোগ্য নয়; যা দরকার তা ঠিক এর বিপরীত—অর্থাৎ দরকার সততা ও বিনয়ের মনোভাব।

"অনুশীলন সম্পর্কে" (জুলাই, ১৯৩৭)

অধ্যয়নের শত্রু হচ্ছে আত্মপ্রসাদ, প্রকৃতই কিছু শিখতে হলে অবশ্যই আমাদের আত্মতুষ্টি থেকে মুক্ত থাকতে হবে। নিজেদের প্রতি "শিক্ষা গ্রহণে অতৃপ্ত থাকা" এবং অন্যদের প্রতি "শিক্ষাদানে অক্লান্ত হওয়া"—এই মনোভাব আমাদের থাকা উচিত।

"জাতীয় যুদ্ধে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা" (অক্টোবর, ১৯৩৮)

কিছু কিছু লোক কয়েকখানা মার্কসবাদী বই পড়ে নিজেদেরকে মস্ত পণ্ডিত ঠাওরান; কিন্তু তাঁরা যা পড়েছেন তা' তাঁদের মাথায় ঢোকে নি এবং মনের মধ্যে শিকড় গাড়ে নি, তাই তাঁরা তা' ব্যবহার করতে জানেন না, তাঁদের শ্রেণী-অনুভূতি আগের মতোই থেকে যায়। আরো কিছু সংখ্যক লোক ভয়ানক অহঙ্কারী এবং কয়েকটি কেতাবী বুলি শিখে নিজেদেরকে তাঁরা সবজান্তা মনে করেন, লেজ ফুলিয়ে আকাশে তুলে ধরেন, কিন্তু ঝড় উঠামাত্রই

তাঁরা শ্রমিক ও অধিকাংশ শ্রমজীবী কৃষকদের চেয়ে বেশ ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তীরা দ্বিধাগ্রস্ত, আর পরবর্তীরা অবিচলিত; পূর্ববর্তীরা অস্পষ্ট, আর পরবর্তীরা স্পষ্ট।

"প্রচার কার্য সম্পর্কে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ" (১২ই মার্চ, ১৯৫৭)

মার্কসবাদ শিক্ষা করতে হ'লে, শুধুমাত্র পুস্তক থেকেই নয়, বরং প্রধানতঃ শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এবং শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়েই তা সত্যি সত্যি আয়ত্ত করা সম্ভব। কয়েকখানা মার্কসবাদী বই পড়া ছাড়াও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যদি শ্রমিক-কৃষকসাধারণের সংস্পর্শের মধ্য দিয়ে ও নিজেদের কাজের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তা'হলে আমরা সবাই অর্জন করবো একটা অভিন্ন ভাষা, শুধুমাত্র দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রের অভিন্ন ভাষা

নয়, বরং সম্ভবতঃ কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও অভিন্ন ভাষা। তা যদি ঘটে তা'হলে নিশ্চয়ই আমরা সবাই আরো ভালভাবে কাজ করতে পারব।

ঐ

毛主席語录
*
外文出版社出版（北京）
1972年（100开）第一版
编号：（孟加拉）1050—889
00050
1—Be—734Pk